রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমকালীন আরবের অবস্থা ও তাঁর মক্কী জীবন

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

মো. আব্দুল কাদের

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2013 - 1434

IslamHouse.com

حالة العرب عند مبعث النبي ﷺ وحياته المكية

« باللغة البنغالية »

د. محمد عبد القادر

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2013 - 1434

IslamHouse.com

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমকালীন আরবের অবস্থা ও তাঁর মক্কী জীবন

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ দা'ঈ বা আহ্বানকারী। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সত্য দীন সহকারে মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণের পথ নির্দেশক হিসেবে সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক রূপে পাঠিয়েছেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পর থেকে নয় বরং জন্মলগ্ন থেকেই তিনি ছিলেন আদর্শের মূর্ত প্রতীক। বাল্যকাল থেকেই তিনি সে আদর্শ প্রচার-প্রসারের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রস্তুত করতে থাকেন। চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তায় তিনি ছিলেন এক অনন্য ও ব্যতিক্রমধর্মী আদর্শবান বালক। আল্লাহ প্রথম থেকেই তাঁকে মহান দা'ওয়াতের জন্য উত্তম চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষন দিয়েছেন। অতএব, তাঁর দা'ওয়াত ছিল হিকমত ও কৌশলপূর্ণ।

ক. সমকালীন আরবের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার নিকট একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। এটি এক আল্লাহর একত্ববাদ ও সার্বিক বিষয়ে তাঁর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। যুগে যুগে প্রেরিত সকল নবী-

রাসূল এ দীনের পতাকাবাহী ছিলেন।[1] অতএব, আল্লাহ তা'আলার নিকট একমাত্র ও গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ وَمَا ٱخۡتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ١٩ ﴾ [آل عمران: ١٩]

"নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দ্বীন। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা কেবলমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশত তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর কেউ আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে কুফরী করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।"

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

---

[1] সকল নবী-রাসূলের ধর্ম ছিল আল-ইসলাম। তাঁরা সবাই এ জীবনাদর্শের অনুসারী ছিলেন এবং স্ব স্বজাতিকে এ আদর্শের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। নূহ 'আলাইহিস সালাম ইবরাহিম 'আলাইহিস সালাম ইয়াকুব 'আলাইহিস সালাম, ইউসূফ 'আলাইহিস সালাম, সুলায়মান 'আলাইহিস সালাম ও মূসা 'আলাইহিস সালাম সহ সকলের বক্তব্যে এটি পরিদৃষ্ট হয়। আল-কুরআন, সূরা ইউনুস : ৭২; সূরা আল-বাকারা : ১২৮, ১৩২; ইউসূফ : ১০১ ; আন্ নমল : ৩০-৩১, ইউনুছ: ৮৪।

﴿ وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥ ﴾ [ال عمران: ٨٥]

"আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করবে তা কখনো আল্লাহর নিকট গ্রহনযোগ্য হবে না। আর আখেরাতের জীবনে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্ন্তভুক্ত হবে।"[2]

কিন্তু এ দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা যুগে যুগে বিভিন্ন নবী-রাসূলগণের সময়ে বিকৃত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। ফলে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে বিভিন্ন রকমের জাহেলী কুসংস্কারে এটি ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। এসময়ে বিভিন্ন ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। পূর্ববতী নবী-রাসূলগণের অনুসারীদের মধ্য হতে বিকৃত, পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজক প্রভৃতি জাতি ও গোষ্ঠীর সূচনা হয়। এ গুলো বিশেষত: আরব, রোম, পারস্য, হিন্দুস্থান ও চীনদেশে বিস্তৃতি লাভ করেছিল।[3] এ ধরনের অধঃপতনের

---

[2] আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান : ১৯।

[3] ড. আব্দুর রহমান আনওয়ারী, মানহাজুদ দা'ওয়াহ ওয়াদ দু'আত ফিল কুরআনিল কারীম, (অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি. থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ১৯৯৮), পৃ. ৮৭৬।

অন্যতম কারণ ছিল ঈসা ‘আলাইহিস সালাম-এর পৃথিবী থেকে উত্থিত হয়ে যাওয়ার পর হতে ৫৭০ বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনো নবী-রাসূলের আবির্ভাব না হওয়া।[4] ঐতিহাসিকগণ সে সময়কে আইয়্যামে জাহেলিয়্যা বলে আখ্যায়িত করেছেন।[5] আইয়্যাম অর্থ যুগ, দিন বা সময়। আর জাহেলিয়্যা অর্থ মূর্খতা, অজ্ঞতা ও সভ্যতা বিবর্জিত। রূপক অর্থে কুসংস্কার, বর্বরতা, ধর্মহীনতা।[6] রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব কিংবা হিজরতের পূর্বে এক শতাব্দী আরব অধিবাসীদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক

---

[4] তাহের সূরাটী, *প্রাগুক্ত,* ৫১৫।

[5] ড. ওসমান গনী, *মহানবী,* (কলিকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৬), পৃ. ১০৯ ; মুহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোস্তফা চরিত,* (কলিকাতা : রনি এন্টারপ্রাইজ, ১৯৮৭ খৃ.), পৃ. ১৪৯ ; ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন চরিত, অনু: মাওলানা আব্দুল আউয়াল, (ঢাকা : ইসলামিক ফাইন্ডেশন, ১৯৯৮ খৃ.), পৃ. ৮১ ; P.K Hitti, *History of the Arabs,* (London : Macmillan Education Ltd, 1986), p. 3 .

[6] ড. ইবরাহীম মাদকুর, আল-মু’জামুল ওসীত, (দেওবন্দ : ইউপি, তা.বি) পৃ. ১৪৪ ; মনির আল-বা’লাবাক্কি, আল-মাওরিদ, (বৈরুত: দারুল ইলম্ লিল মালাঈন, ১৯৭৬ খৃ.), পৃ. ২৪৮ ; Thomas Patrick, Dictionary of Islam , (India: Cosmo Publication, 1986), opcit, p. 224.; আল-কুরআনে জাহেলিয়্যাহ শব্দটি চারবার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, ৩:১৫৪ ; ৫:৫০ ; ৩৩: ৩৩ ; ৪৮: ২৬।

কর্মকাণ্ড ওহী সমর্থিত ছিল না বিধায় ঐ সময়টাকে আইয়ামে জাহেলিয়্যাহ বলা হয়।[7]

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের সময় তৎকালীন আরব ধর্মীয় দিক থেকে সবচেয়ে খারাপ ও নিকৃষ্ট অবস্থানে পৌঁছে গিয়েছিল। এসময় তাদের ধর্ম বিশ্বাসে শির্ক, মুর্তিপূজা, গ্রহ-নক্ষত্র, দেব-দেবী, পাহাড়-পর্বত, পশু-পক্ষী, পাথর, ইত্যাদির উপাসনা বিরাজমান ছিল। এভাবে মানুষ এক আল্লাহর স্থলে বহু প্রভূর উপাসনার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সমকালীন আরবের ধর্মীয় অবস্থাকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে বিশ্লেষণ করা যায়,

১. শির্কের প্রচলন

শির্ক-এর শাব্দিক অর্থ অংশীদার স্থাপন করা, ঈমান কিংবা ইবাদতে অংশীদার করা, বহুইশ্বরবাদ।[8] যারা আল্লাহর ইবাদতের সাথে অন্যকে শরীক করে, শির্ক স্থাপন করে, তাদের মুশরিক বলা

---

[7] P.K Hitti, *History of the Arabs*, (London : Macmillan Education Ltd, 1986), p.87 .

[8] ড. মুহাম্মদ ফজলূর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩১।

হয়। এটা তাওহীদের বিপরীত। তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করত না; বরং তাঁর ইবাদতের সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করত। এমর্মে কুরআন মাজীদে এসেছে:

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ٦١ ﴾ [العنكبوت: ٦١]

"যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ, তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।"[9] এছাড়াও তারা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ তা'আলাই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যমীনকে জীবিত করেন, এবং মৃতকে জীবিত করেন, তদুপরি তারা শরিক স্থাপন হতে বিরত থাকত না।[10] শুধু

---

[9] আল-কুরআন, সূরা আনকাবূত : ৬১।

[10] কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে,

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٦٣ ﴾ [العنكبوت: ٦٣]

কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে

﴿فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ٦٥﴾ [العنكبوت: ٦٥]

অন্যত্র আরও বলা হয়েছে

তাই নয়, তারা আল্লাহর রুবুবিয়তেও বিশ্বাস পোষণ করত কিন্তু সেক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তির উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন উপাস্যের ধারণা করত, যেগুলোকে তাদের উপকারী, ক্ষতিসাধনকারী, অস্তিত্বদানকারী ও ধ্বংসকারী বলে মনে করত।[11] এগুলোর ইবাদতে তাঁরা নিয়োজিত হত এ প্রত্যাশায় যে, এগুলো আল্লাহর নৈকট্য লাভে ও সুপারিশকারী হবে। কুরআন মাজীদে তাদের আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে এসেছে,

﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ ٣﴾ [الزمر: ٣]

﴿ قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أَمَّن يَمۡلِكُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَمَن يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُۚ فَقُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣١ ﴾ [يونس: ٣١]

আল-কুরআন, সূরা আনকাবূত : ৬৩ ও ৬৫; সূরা ইউনুস : ৩১।

[11] আবুল হাসান আলী আন্ নদভী, *সিরাতুন নববীয়্যাহ,* (লখনৌ: মাজমা‘ ইসলামী ‘ইলমী, তা.বি), পৃ. ৩০।

“যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এজন্যই করি, যে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে।”[12]

আরবের মুশরিকরা ফেরেশ্তাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যায়িত করত। “জ্যোতিষীর”[13] কথার উপর ছিল তাদের পূর্ণ আস্থা।[14] জ্যোতিষীরা কিছু জিন হাসিল করে তাদের মাধ্যমে বহু কল্পিত, মিথ্যা ভবিষ্যতদ্বাণী করে জনসাধারণ হতে বহু অর্থ উপার্জন করত। মূলত এটা ছিল তাদের উপার্জনের মাধ্যম। মানুষকে ধোঁকা দিয়ে টাকা পয়সা লুট করাই ছিল তাদের পেশা।[15]

---

[12] আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার : ৩।

[13] জ্যোতিষী সেসব লোককে বলা হতো, যারা নক্ষত্রের গতি সম্পর্কে গবেষণা করতো এবং হিসাব-নিকাশ করে বিশ্বের ভবিষ্যত ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করতো। (মোল্লা আলী ক্বারী, *মিরকাতুল মাফাতিহ শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ,* ২য় খণ্ড, (লক্ষ্ণৌ : তা.বি), পৃ. ৩)।

[14] তাহের সূরাটী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫১৩।

[15] আমর ইবন লুহাই বনু খুজা‘আ গোত্রের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ছোটবেলা থেকে এ লোকটি ধর্মীয় পূণ্যময় পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছিল। ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে তার আগ্রহ ছিল অসামান্য। সাধারণ মানুষ তাকে ভালবাসার চোখে দেখতো এবং নেতৃস্থানীয় ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে মনে করে তার অনুসরণ করতো। এক পর্যায়ে এ লোকটি সিরিয়া সফর করে। সেখানে যে মূর্তিপূজা করা হচ্ছে সে মনে করলো এটাও

২. মূর্তিপূজা

আরবের মুশরিকদের বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করত। তারা গাছ, পাথর ও মাটি দিয়ে বিভিন্ন মানুষ বা প্রাণীর ছবি তৈরী করত। মূর্তির সাথে তাদের এক ধরনের ভালবাসা জন্মে গিয়েছিল। বনু খুজা'আ গোত্রের সরদার 'আমর ইবন লুহাই নামক এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম আরবদের মধ্যে মূর্তির প্রচলন করেছিলেন।[16] অবশ্য তার পূর্বেই নূহ 'আলাইহিস সালাম-এর

বুঝি আসলেই ভাল কাজ। যেহেতু সিরিয়ায় অনেক নবী আবির্ভূত হয়েছেন এবং আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে। কাজেই সিরিয়ার জনগণ যা করছে সেটা নিশ্চয় ভালো কাজ এবং পূণ্যের কাজ। এরূপ চিন্তা করে সিরিয়া থেকে ফেরার পথে সে 'হুবাল' নামের এক মূর্তি নিয়ে এসে সেই মূর্তি কা'বাঘরের ভেতর স্থাপন করলো। এরপর সে মক্কাবাসীদের মূর্তিপূজার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে শির্ক করার আহবান জানালো। মক্কার লোকেরা ব্যাপকভাবে তার ডাকে সাড়া দেয়। মক্কার জনগণকে মূর্তিপূজা করতে দেখে আরবের বিভিন্ন এলাকার লোকজন তাদের অনুসরণ করলো। কেননা, কা'বাঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারীদের বৃহত্তর আরবের লোকেরা ধর্মগুরু মনে করতো। (শায়খ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওহাব, *মুখতাছারুস সীরাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২)।

[16] সর্বপ্রথম 'কাওমে নূহ' মূর্তিপূজার প্রচলন করেছিল। তারা ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুছ, ইয়া'উক ও নসর নামক মূর্তির পূজা করত। এ মর্মে কুরআনে এসেছে

﴿ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرٗا ٢٣ ﴾ [نوح: ٢٣]

"তারা বলল, তোমরা ছাড়বে না তোমাদের উপাস্যদের এবং তোমরা ওয়াদ্দ, সূওয়া, ইয়াগুছ, ইয়া'উক ও নসরের উপাসনা পরিত্যাগ করবে না।" আল-কুরআন, সূরা নূহ : ২৩।

সময়ে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজার সূচনা হয়।[17] তাদের দেবতাদের মধ্যে ‘লাত’ ‘মানাত’ ও ‘উয্যা’ ছিল প্রসিদ্ধ ও প্রধান মূর্তি। এছাড়াও তারা ‘ইসাফ’ ও ‘নায়েলা’ নামক মূর্তিরও উপাসনা করত।[18] এসব

ওয়াদ ছিল ‘কালব’ গোত্রের দেবতা, ‘সুওয়া’ ‘হুযাইল’ গোত্রের, ‘ইয়াগুছ’ ‘মায্যাহ’ গোত্রের, ‘ইয়া‘উক’ ইয়ামেনের ‘হামদান’ গোত্রের এবং ‘নাসর’ ইয়ামেন অঞ্চলের ‘হিমইয়ার’ গোত্রের দেবতা ছিল। (ড. জামীল আব্দুল্লাহ আল-মিসরী, *তারিখুদ দা‘ওয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ ফি যামানির রাসূল ওয়াল খোলাফায়ির রাশেদীন,* (মদীনা মুনওয়ারা : মাকতাবাতুদ দার, ১৯৮৭ খৃ.), পৃ. ৩১।

[17] এ মর্মে কুরআন মাজীদে এসেছে

﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ۝١٩ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ۝٢٠ ﴾ [النجم: ١٩، ٢٠] “তোমরা কি ভেবে দেখছো ‘লাত’ ও ‘উয্যা’ সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরেকটি ‘মানাত’ সম্পর্কে ?” আল-কুরআন, সূরা আন্ নাজম : ১৯-২০।

লাত: চারকোণ বিশিষ্ট একটি পাথরের মূর্তি, যার চতুষ্পার্শে আরবরা তাওয়াফ করতো। এটি তায়েফে স্থাপন করা হয়েছিল। (আল্লামা ছফিউর রহমান মুবারকপূরী, *আর রাহীকুল মাখতুম,* অনু: খাদিজা আক্তার রেজায়ী, (ঢাকা: আল-কোরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ সেন্টার, ৯ম সংস্করণ, ২০০৩), পৃ. ৫১)।

মানাত : কালো পাথরে নির্মিত মূর্তি, যা লোহিত সাগরের উপকূলে কোদাইদ এলাকার মুসাল্লাল নামক জায়গায় স্থাপন করা হয়েছিল। (প্রাগুক্ত)

উয্যা: উয্যা ছিল ‘আরাফাতের নিকটবর্তী ‘নাখলা’ নামক স্থানের মূর্তি। কুরাইশদের নিকট এ মূর্তিটি সর্বাধিক সম্মানিত ছিল।

[18] ইসাফ’ ছিল কা‘বাঘর সংলগ্ন। আর ‘নায়েলা’ ছিল যমযমের কাছে। কুরায়শরা কা‘বা সংলগ্ন মূর্তিটাকেও অপর মূর্তির কাছে সরিয়ে দেয়। এটা ছিল সে জায়গা যেখানে আরবরা কুরবানী করত। (সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, *নবীয়ে রহমত,* অনু:

মূর্তির অনুসরণে স্বল্প সময়ের মধ্যে হেজাজের সর্বত্র শির্কের আধিক্য এবং মূর্তি স্থাপনের হিড়িক পড়ে যায়। প্রত্যেক গোত্র পর্যায়ক্রমে মক্কার ঘরে ঘরে মূর্তি স্থাপন করে। পবিত্র কা'বা গৃহেই ৩৬০ টি দেবতার মূর্তি ছিল। ৩৬০ দিনে হয় এক বছর। তারা প্রত্যেক দিনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট মা'বুদের পূজা করত।[19] মক্কার অলিতে-গলিতে মূর্তি ফেরী করে বিক্রি করা হত। দেহাতী লোকেরা এটা পছন্দ করত, খরিদ করত এবং এর দ্বারা আপন ঘরের সৌন্দর্য্য বর্ধন করত।[20] এছাড়াও পৌত্তলিকরা বিভিন্নভাবে উল্লেখিত মূর্তির উপাসনা করত। যেমন,

ক. তারা মূর্তির সামনে নিবেদিত চিত্তে বসে থাকত এবং তাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করত। তাদেরকে জোরে জোরে ডাকত এবং প্রয়োজনপূরণ, মুশকিল আসান বা সমস্যার সমাধানের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করত।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, (ঢাকা ও চট্টগ্রাম : মজলিস নাশরাত-ই-ইসলাম, ১৯৯৭ খৃ), পৃ. ১১১।

[19] তাহের সূরাটী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫১৫।

[20] সাইয়্যেদ আবুল হাসান নদভী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১১১।

খ. মূর্তিগুলোর উদ্দেশ্যে হজ্ব ও তওয়াফ করতো। তাদের সামনে অনুনয় বিনয় এবং সিজদায় উপনীত হতো।

গ. মূর্তির নামে নযর-নেওয়ায ও কুরবানী করত। এমর্মে কুরআনে এসেছে, "তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে সেসব জন্তু যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নিয়ে যবাই করা হয়েছে হয়।"[21]

ঘ. মূর্তির সন্তুষ্টি লাভের জন্য পানাহারের জিনিস, উৎপাদিত ফসল এবং চতুষ্পদ জন্তুর একাংশ মূর্তির জন্য তারা পৃথক করে রাখতো। পাশাপাশি আল্লাহর জন্যেও একটা অংশ রাখতো। পরে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহর জন্য রাখা অংশ মূর্তির কাছে পেশ করতো। কিন্তু মূর্তির জন্য রাখা অংশ কোন অবস্থায়ই আল্লাহর কাছে পেশ করতো না।[22]

---

[21] আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা : ৩।

[22] আল্লাহ বলেন,

﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلۡحَرۡثِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ نَصِيبٗا فَقَالُواْ هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعۡمِهِمۡ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَاۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمۡ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمۡۗ سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ ١٣٦ ﴾ [الانعام: ١٣٦]

"আল্লাহ যেসব শষ্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তারা আল্লাহর জন্যে একাংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা মতে বলে, এটা আল্লাহর জন্যে এবং এটা আমাদের দেবতাদের জন্যে। যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহর কাছে পৌঁছে

এছাড়াও তারা বিভিন্ন মূর্তির নামে পশু মানত করতো। সর্বপ্রথম মূর্তির নামে পশু ছেড়েছিল, ‘আমর ইবন লুহাই।[23] তারা এসব আচার অনুষ্ঠান এজন্যে পালন করতো যে, এগুলো তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম করে দেবে এবং আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করবে।[24] তাদের এ আকীদা বিশ্বাসের বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, “ওরা আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করে তা তাদের ক্ষতিও করে না, উপকারও করে না। ওরা বলে এগুলো আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশকারী।[25] তারা বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তির ধারণা পোষণ করে পূজা করত। যখন কোনো সফরের ইচ্ছা করত, তখন তারা বাহনে আরোহন করার সময় মূর্তি স্পর্শ করত। সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে এটা ছিল তাদের শেষ কাজ এবং ফিরে এসেও ঘরে প্রবেশের পূর্বে এটা ছিল তাদের সর্বপ্রথম কাজ।

না। কিন্তু যা আল্লাহর অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছায়। তারা যা মীমাংসা করে তা বড়ই নিকৃষ্ট।” আল-কুরআন, সূরা আল-আন‘আম : ১৩৬।

[23] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৯৯।

[24] আল-কুরআন, সূরা ইউনুস : ১৮।

[25] ইবন হিশাম, *সীরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম* ১ম খণ্ড, (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯৪ ইং), পৃ. ৬৫।

নৈতিক ও চারিত্রিক দিক থেকে তাদের অবস্থা খুবই নাজুক ছিল। তাদের মাঝে জুয়া খেলা ও মদপানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়পূজা, ও নাচগানের আসর জমাত অধিক হারে এবং এতে মদপানের ছড়াছড়ি চলত। বহু রকমের অশ্লীলতা, জুলুম-নির্যাতন, অপরের অধিকার হরণ, বে-ইনসাফী ও অবৈধ উপার্জনকে তাদের সমাজে খারাপ চোখে দেখা হত না।[26]

মক্কার মূল ও প্রাচীন বাসিন্দা জা'ফর ইবন আবি তালিব আবিসিনিয়া অধিপতি নাজ্জাসীর সামনে তৎকালীন আরব সমাজের ও জাহিলী কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "রাজন! আমরা ছিলাম জাহিলিয়াতের ঘোর তমাসায় নিমজ্জিত একটি জাতি। আমরা মূর্তিপূজা করতাম, মৃত জীব ভক্ষন করতাম, সর্বপ্রকার নির্লজ্জ কাজ করতাম, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করতাম এবং শক্তিশালী ও সবল লোকেরা দুর্বলকে শোষন করতাম।"[27]

উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনায় তাদের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কা'বাঘর তাওয়াফের সময় পুরুষেরা উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করতো এবং

---

[26] সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০।

[27] ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৬।

মহিলারা সব পোষাক খুলে ফেলে ছোট জামা পরিধান করে তাওয়াফ করতো। তাওয়াফের সময় তারা অশ্লিল কবিতা আবৃত্তি করতো। কবিতাটির অনুবাদ নিম্নরূপ:

“লজ্জাস্থানের কিছুটা বা সবটুকু খুলে যাবে আজ।

যেটুকু যাবে দেখা ভাবব না অবৈধ কাজ।”[28]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবকালে সমগ্র পৃথিবীতে নারী জাতির অবস্থা ছিল অতি শোচনীয় ও মর্মান্তিক। আরব সমাজেও নারীর অবস্থা এর ব্যতিক্রম ছিল না। নারী তার দেহের রক্ত দিয়ে মানব বংশধারা অব্যাহত রাখলেও তার সেই অবদানের কোনো স্বীকৃতি ছিল না। সে পিতা, ভ্রাতা, স্বামী সকলের দ্বারা নির্যাতিতা হত। যুদ্ধবন্দী হলে হাটে-বাজারে দাসীরূপে বিক্রয় হত, চতুস্পদ জন্তুর ন্যায়। আরব সমাজে কন্যা সন্তানের জন্মই ছিল এক অশুভ লক্ষণ, সম্মান হানিকর ও আভিজাত্যে কুঠারাঘাততুল্য। তাই কন্যার জন্ম গ্রহণের সাথে সাথে তার জন্মদাতা লজ্জা ও অপমানে মুখ লুকিয়ে বেড়াত এবং

---

[28] আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপূরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

হিতাহিত জ্ঞানশুন্য হয়ে তাকে জীবন্ত মাটি চাপা দিতেও কুণ্ঠাবোধ করত না। কুরআন মাজীদে এ চিত্র খুব সুন্দর ভাবে বিধৃত হয়েছে:

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلۡأُنثَىٰ ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا وَهُوَ كَظِيمٞ ۝٥٨ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓۚ أَيُمۡسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمۡ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتُّرَابِۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ ۝٥٩﴾ [النحل: ٥٨، ٥٩]

“যখন তাদের কাউকেও কন্যার সুসংবাদ প্রদান করা হয়, তখন তাদের মুখমণ্ডল মলীন হয়ে যায় এবং হৃদয় দগ্ধ হতে থাকে। যে বস্তুর সুসংবাদ তাকে দেয়া হয়েছিল তার লজ্জায় সে নিজেকে কওম থেকে লুকিয়ে চলে এবং মনে মনে চিন্তা করে যে, ওকে কি অপমানের সাথে গ্রহণ করবে না কি তাকে মাটির মধ্যে পুতে রাখবে?”[29]

তৎকালীন সময়ে অগণিত নিষ্পাপ শিশুর বিলাপ আরবের মরুবক্ষে মিশে আছে তার হিসেব কে দেবে ? এ ধরনের কত যে ঘৃণ্য ও জঘন্য প্রথা তাদের মধ্যে বিরাজমান ছিল তার কোনো হিসেব নেই। কুরআন মাজীদে সে দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ

---

[29] আল-কুরআন, সূরা আন্ নাহল: ৫৮-৫৯।

তা‘আলা বলেন, “যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল ?”[30]

বিবাহের সময় তাদের মাতামতের কোনো গুরুত্বই ছিল না। একজন পুরুষ অসংখ্য নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারত।[31] একই ভাবে তালাকের ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। পুরুষরা যখনই ইচ্ছা করত যতবার ইচ্ছা তালাক দিত এবং ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তালাক প্রত্যাহার করত।[32]

---

[30] কুরআন মাজীদে এসেছে,

﴿ وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ ٨ بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ ٩ ﴾ [التكوير: ٨، ٩]

আল-কুরআন, সূরা আত্ তাকভীর : ৮-৯।

[31] এ মর্মে হাদীসে এসেছে,

قال ابن عميرة الأسدي: أسلمتُ و عندي ثمان نسوة قال فذكرة ذلك للنبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اختر منهن أربعة"

“ইবন উমায়রা আল-আসাদী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার সময় আমার আটজন স্ত্রী ছিল। বিষয়টি আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানালাম। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাদের মধ্য থেকে চারজনকে বেছে নাও।”

(আবু দাউদ, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুত তালাক, বাবু ফি মান আসলামা ওয়া ইনদাহু নিছায়ান আকছারা মিন আরবা আও উখতানে, হাদীস নং- ২২৪১)।

[32] হাদীসে বর্ণিত আছে,

إن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নিজ স্বামীর ওয়ারিশদের উত্তরাধিকারী সম্পত্তিতে পরিণত হত। তাদের কাউকে কেউ ইচ্ছা করলে বিবাহ করত আথবা অপরের নিকট বিবাহ দিত অথবা আদৌ বিবাহ না দেওয়ার ব্যাপারেও তাদের ইখতিয়ার ছিল, যাতে স্বামী প্রদত্ত তার সম্পদ অপরের হস্তগত হতে না পারে।[33] মৃতের সম্পদে নারীর

"কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তালাক প্রদানের পর তা প্রত্যাহার করার অধিকারী হতো, যদিও সে তাকে তিন তালাক দিত।"

(আবু দাউদ, *প্রাগুক্ত,* বাবু ফী নাসখিল মুরাজা'আ বা'দাত তাতলীকাতিছ ছালাছ, হাদীস নং- ২১৯৫)

[33] সহীহ বুখারীতে এসেছে,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ ١٩﴾ [النساء: ١٩] ، قال عن ابن عباس كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق لامرأته إن شاء بعضهم بزوجها و إن شاءوا لم يزوجها و هم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الأية في ذلك.

"ইবন আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, আল্লাহর বাণী, "হে ঈমানদার লোক সকল! নারীদেরকে জবরদস্তিমূলকভাবে উত্তরাধিকার গণ্য করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা হতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখ না।" সূরা আন্ নিসা : ১৯

ইবন আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার ওয়ারিসগণ তার স্ত্রীর উপর কতৃত্বশীল হতো। কেউ ইচ্ছা করলে তাকে বিবাহ করত অথবা অন্যত্র বিবাহ দিত অথবা বিবাহ না দিয়ে আটকিয়ে রাখত। তার পরিবারের লোকজনের তুলনায় তারা হতো তার উপর কর্তৃত্বশীল। এ সম্পর্কে উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, *প্রাগুক্ত,* তাফসীর সূরা আন্ নিসা, বাবু লা ইয়াহিল্লু লাকুম আন তারিছুন নিসাআ কারহান, হাদীস নং- ৪৫৭৯)।

কোনো উত্তরাধিকারী স্বত্ব স্বীকৃত ছিল না।[34] এমনিভাবে জাহেলী যুগে আরব সমাজে নারী ছিল অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও অধিকার বঞ্চিত। মূলতঃ তাদের দীনী অনুভূতি তথা দীনে ইবরাহীমের থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই এ ধরনের ঘৃণ্য ও জঘণ্য কাজ আঞ্জাম দিতে সক্ষম হয়েছিল।

এছাড়াও জাযিরাতুল আরবের বিভিন্ন এলাকায় ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান মাজুসিয়াত বা অগ্নিপূজক এবং সাবেয়ী মতবাদের ব্যপক প্রচলন ছিল। দীনের ব্যপারে ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা বাড়াবাড়ি করত। ইয়াহূদীরা 'উযাইর 'আলাইহিস সালাম ও খ্রিষ্টানরা ঈসা 'আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করত। তাই তাদের ঈমান আনয়নের দাবী নিরর্থক। তারা পণ্ডিত ও পুরোহিতদেরকে

---

[34] হাদিসে এসেছে: একদা ছাবিত ইবন কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ছাবিত উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন তাঁর দুটি কন্যা সন্তান রয়েছে। কিন্তু ছাবিতের ভাই তার সমস্ত পরিত্যাক্ত সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হয়। (দ্র. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত ফারাইদ, বাবু মা জা'আ ফী মীরাছিস সুলব হাদীস নং-২৮৯১, ইমাম তিরমিযী, *প্রাগুক্ত,* ফারাইদ, বাবু মাজআ ফী মীরাযিল বনাত, হাদীস নং ২০৯২; অবশ্য তিরমিযীতে ছাবিতের স্থলে সা'দ ইবনুর রবী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উল্লেখ আছে)।

তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে এবং মরিয়মের পুত্রকেও। ফলে তারাও সমকালীন আরবে অন্যান্যদের ন্যায় শির্কে নিমজ্জিত ছিল। ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা আসার পরও তারা মতবিরোধ করত। তাদের চরিত্র নিরূপণ করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ لَيۡسَتِ ٱلنَّصَٰرَىٰ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَىٰ لَيۡسَتِ ٱلۡيَهُودُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَهُمۡ يَتۡلُونَ ٱلۡكِتَٰبَۗ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ مِثۡلَ قَوۡلِهِمۡۚ فَٱللَّهُ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ ١١٣﴾ [البقرة: ١١٣]

"ইয়াহূদীরা বলে, খ্রিষ্টানরা কোন ভিত্তির উপরেই নয়, আবার খ্রিষ্টানরা বলে ইয়াহূদীরা কোন ভিত্তির উপরেই নয়, অথচ তারা কিতাব পাঠ করে। এমনিভাবে যারা মূর্খ তারাও ওদের মতই উক্তি করে। অতএব, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা দিবেন। যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করেছিল।"[35]

তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের পদাংকের অন্ধ অনুসারী ছিল। যখন তাদের নিকট হেদায়াতের বাণী আসত তখন তারা বলত

---

[35]আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা : ১১৩।

ইতোপূর্বে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পথ অনুসরণ করে চলেছি, এখনও তাদের অনুসরণ করে যাব। এ মর্মে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ أَمۡ ءَاتَيۡنَٰهُمۡ كِتَٰبٗا مِّن قَبۡلِهِۦ فَهُم بِهِۦ مُسۡتَمۡسِكُونَ ٢١ بَلۡ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّهۡتَدُونَ ٢٢ ﴾ [الزخرف: ٢١، ٢٢]

“আমি কি তাদেরকে কুরআনের পূর্বে কোনো কিতাব দিয়েছি? ফলে তারা তা আকড়ে রেখেছে? বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপূরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে পথপ্রাপ্ত।”[36]

মক্কার পৌত্তলিকরা ভাগ্য পরীক্ষার জন্য ‘আযলাম’[37] বা ফাল-এর তীর ব্যবহার করত। এ কাজের জন্য তাদের সাতটি তীর ছিল। তম্মধ্যে একটিতে نعم (হ্যাঁ) অপরটিতে لا (না) এবং অন্যগুলোতে অন্য শব্দ লিখিত ছিল। এ তীরগুলো কাবাগৃহের খাদেমের কাছে থাকত। কেউ নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে অথবা কোনো কাজ করার পূর্বে তা উপকারী হবে না অপকারী, তা জানতে

---

[36] আল-কুরআন, সূরা যুখরুফ : ২১-২২।

[37] أزلام শব্দটি زلم এর বহুবচন। ‘যালাম’ এমন তীরকে বলা হয়, যে তীরে পালক লাগানো থাকে না।

চাইলে সে কা'বার খাদেমের কাছে পৌঁছে একশত মুদ্রা উপঢৌকন দিত। অতঃপর খাদেম তীর বের করে আনত, যদি তাতে হ্যাঁ লেখা থাকে তবে কাজটিকে উপকারী মনে করা হত। অন্যথায় তারা বুঝে নিত যে. কাজটি করা ঠিক হবে না।[38]

শুধু এ সকল কুসংস্কারে বিশ্বাস করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি বরং রিসালাত ও আখিরাতকেও তারা অস্বীকার করত। তাদের ধারণা ছিল যে, পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন, কালের প্রবাহেই মৃত্যু হয়।[39]

তাছাড়া তাদের আরও বিশ্বাস ছিল যে, কোনো মানব রাসূল হতে পারে না, এ ধারণা তাদেরকে রিসালাতে অবিশ্বাসী করার জন্য প্ররোচিত করত।[40]

---

[38] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩০৮।

[39] আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنۡيَا نَمُوتُ وَنَحۡيَا وَمَا يُهۡلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهۡرُۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنۡ عِلۡمٍۖ إِنۡ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ ٢٤ ﴾ [الجاثية: ٢٤]

আল-কুরআন, সূরা জাসিয়া : ২৪।

[40] আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤۡمِنُوٓاْ إِذۡ جَآءَهُمُ ٱلۡهُدَىٰٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرٗا رَّسُولٗا ٩٤ ﴾ [الاسراء: ٩٤]

৩. হানীফ সম্প্রদায়

আরবরা মুসলিম মিল্লাতের নেতা ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম-এর প্রিয়তম স্ত্রী হাজেরা ও তার পুত্র ইসমাঈল 'আলাইহিস সালাম-এর স্মৃতি বিজড়িত সাফা মারওয়া পর্বতদ্বয়, যমযমকুপ, এবং পবিত্র কা'বাগৃহ অবস্থিত হওয়ায় এ স্থানের জনগণ পূর্ব হতেই ধর্মীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত ছিল। তবে দীর্ঘদিন এ অঞ্চলে নবী ও রাসূলের আগমন না হওয়ায় অধিকাংশের মধ্যে একেশ্বরবাদের পরিবর্তে বহু ইশ্বরের পূজা তথা শির্ক এবং নানা প্রকার কুসংস্কার প্রবেশ করে। সেখানে বসবাসরত ইয়াহূদী[41],

---

আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল : ৯৪।

[41] ইয়াকুব 'আলাইহিস সালাম-এর চতুর্থ পুত্র 'ইয়াহূদা' এর নামে এ ধর্মের নামকরণ করা হয় ইয়াহূদী। এরা পুরোহিত ও পণ্ডিতগণের ধ্যান-ধারণা ও ঝোঁক প্রবণতা অনুযায়ী আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করতো এবং ধর্মীয় রীতিনীতির কাঠামো তৈরী করতো। তাদের ধর্মীয় গ্রন্থের নাম 'তালমূদ'। (মাযহার উদ্দিন সিদ্দিকী, *ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম,* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খৃ. ১৯৯১), পৃ. ৫২-৫৩ ; সাইয়্যেদ আবুল হাসান আন নদভী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪০) সত্যিকার অর্থে মূসা 'আলাইহিস সালাম ছিলেন তাদের জন্য প্রেরিত রাসূল। তারা ছিল দারুন কুচক্রী ও প্রতারক। তাদের চরিত্র ও নৈতিকতা বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤ ﴾ [التوبة: ٣٤]

খ্রিষ্টান[42] এবং সাবেয়ীগণ[43] ছাড়াও কিছু সংখ্যক লোক এক আল্লাহকে বিশ্বাস করতো।

সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ঘোর তমাসাচ্ছন্ন সমাজে এমন কতিপয় লোকের বসবাস ছিল যাদেরকে জাহেলিয়াতের রুসম-রেওয়াজ, মূর্তিপূজা, শির্ক প্রভৃতির কোন কিছুই স্পর্শ করতে পারে নি। তারা দীনে ইবরাহীমের উপর অটল ও অবিচল ছিল। কুরআন মাজীদে এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে "নিঃসন্দেহে যারা মুসলিম হয়েছে এবং যারা ইয়াহূদী, নাসারা এবং সাবেঈন (তাদের মধ্য থেকে) যারা

আল-কুরআন, সূরা আত্ তাওবা : ৩৪ এ ছাড়াও আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেমন : ২:১১৩, ১২০; ৩: ৬; ৫: ২০, ৫৪, ৬৭, ৮৫; ৯ : ৩০। (মুহাম্মদ ইবন আব্দুল করিম ইবন আবু বকর আহমদ আল-শাহরাস্তানী, *আল-মিলাল ওয়াল নিহাল,* ১ম খণ্ড, (মিসর : মাকতাবা মুস্তফা আল-বাবী আল হালবী ওয়া আওলাদুহু, খৃ.১৯৯৭), পৃ. ২০৯।

[42] খ্রিষ্টানরা নিজেদেরকে ঈসা 'আলাইহিস সালাম-এর অনুসারী বলে দাবী করে থাকে। আল্লাহ রাববুল আলামীন তাদের জন্য ইঞ্জীল কিতাব অবতীর্ণ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তারা এ কিতাবে বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের বিকৃতি ঘটায়। কুরআন মাজীদে বিভিন্ন জায়গায় তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন: আল-কুরআন, সূরা আস-সফ : ১৪; আল-বাকারা : ৬২।

[43] নক্ষত্র ও ফেরেশ্তাপূজক। এরা নিজেদের পছন্দমত বিভিন্ন ধর্ম থেকে কিছু কিছু গ্রহণ করেছিল। ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৭৮।

ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রাতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে, তার সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে। আর তাদের কোনই ভয়-ভীতি নেই, তারা দূঃখিতও হবে না।”[44]

উপরোক্ত আয়াতে কারীমার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দা‘ওয়াতের পূর্বেও আরবে একদল ঈমানদারের অস্তিত্ব বিদ্যামান ছিল। আর তাদেরকেই বলা হয় ‘হানীফ সম্প্রদায়’।[45] তারা বিভিন্ন গোত্রের মধ্য হতে বিভিন্ন মতের অধিকারী ছিল। ফলে তাদের মাঝে কোনো ঐক্য ছিল না। হানীফ সম্প্রদায় আল্লাহর একত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল বটে, কিন্তু তাদের এ ধ্যান-ধারণা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে নি। তবে মূর্তিপূজা ও শির্ক নির্মূলে তারা ঐক্যবদ্ধ ছিল। তাদের মধ্যে

---

[44] আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَٓخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٢ ﴾ [البقرة: ٦٢]

আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা : ৬২।

[45] হানীফ অর্থ একনিষ্ঠ। আল-কুরআনে কা‘বা নির্মাতা ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম-কে হানীফ হিসেবে উল্লেখ করেছে। আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা:১২৪।

উমাইয়া ইবন আবি সালত, ইবন আওফ আল-কিনানী, হাশিম ইবন আবদ্ মান্নাফ, ওরাকাহ্ ইবন নওফল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[46]

অতএব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা সত্যের দা'ওয়াত গ্রহণ করার জন্য স্বল্প সংখ্যক হলেও একনিষ্ঠ তাওহীদপন্থী লোকের অস্তিত্ব সমকালীন আরবে বিদ্যমান রেখেছিলেন। পি.কে হিট্টি বলেন যে, ধর্ম বিষয়ে আরবের সাধারণ অবস্থা একটা পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল বলে মনে হয় এবং একজন সমাজ সংস্কারক ও জাতীয় নেতা আবির্ভাবের জন্য মঞ্চ তৈরী হচ্ছিল।[47]

তৎকালীন আরবের রাজনৈতিক অবস্থা খুবই নাজুক ও অস্থিতিশীল ছিল। জোর যার মুল্লুক তার এ নীতি সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল। সামান্য ও তুচ্ছ বিষয়ে তাদের মাঝে বিরোধ দেখা দিত। প্রতিশোধ প্রবণতা ছিল তাদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তারা অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করতে উদ্যত হত। কোনো হত্যাকাণ্ড

---

[46] মুহাম্মদ ইদ্রীস কানদেহলভী, *সীরাতুল মোস্তফা,* (দেওবন্দ : ইরশাদ বুক ডিপো, তা.বি.), পৃ. ১৩৯।

[47] P.K Hitti, op.cit, P.87.

সংগঠিত হলে তার প্রতিশোধ অন্যায়ভাবে আরেকটি হত্যাকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে নিত। ফলে ন্যায়-অন্যায় এর মাঝে বিচার-বিশ্লেষনের কোনো তোয়াক্কা করত না। সমাজের মানুষ দাস ও প্রভু এ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। শাসকবর্গ অর্থসম্পদ কেবল নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ, আরাম-আয়েশ, ঐশ্বর্য ও বিলাসিতায় ব্যয় করতো। আর জনগণ অনাহারে জীবন-যাপন করত। শাসকরা জনগণের উপর সকল প্রকার জুলুম-অত্যাচার চালিয়ে যেত, জনগণ সেসব মুখ বুঁজে নির্বিচারে সহ্য করতো। কোনো প্রকার অভিযোগ করার তাদের উপায় ছিল না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভবের সময়ে তাদের সমাজিক কাঠামো বিপর্যস্ত ও ধ্বংসের মূখোমুখি ছিল। তারা এক উপদ্বীপে বাস করলেও তাদের মাঝে সামাজিক রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল না। বরং সেটি বিভিন্ন গোত্রের গোত্রপতি কর্তৃক শাসিত বহুরূপী রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। বিভিন্ন গোত্র ও জাতির মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ সবসময় লেগেই থাকত।

তৎকালীন সময় রোম এবং পারস্য সাম্রাজ্য ছিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

আগমনের সময় এ দু’ শক্তির মাঝে যুদ্ধ চলছিল। কুরআন মাজীদে তাদের যুদ্ধের চিত্র তুলে ধরেছে এভাবে,

﴿ الٓمٓ ١ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ٢ فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ ٣﴾ [الروم: ١، ٣]

“আলিফ, লাম, মীম। রোমকরা পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিসত্বর বিজয়ী হবে।[48]

বস্তুত আরবরা ছিল অত্যন্ত কলহকারী ও বিশৃংখল জাতি।[49] খুব ছোট-খাট বিষয়ে তাদের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ লেগে যেত এবং পরবর্তীতে তা যুদ্ধে পরিণত হতো। এক উষ্ট্রী হত্যাকে কেন্দ্র করে তাদের মাঝে প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ যুদ্ধ চলছিল। ইতিহাসে এটি

---

[48] আল-কুরআন, সূরা আর রূম : ১-৩।

[49] আল্লাহ বলেন,

﴿وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِّن قَرۡنٍ هَلۡ تُحِسُّ مِنۡهُم مِّنۡ أَحَدٍ أَوۡ تَسۡمَعُ لَهُمۡ رِكۡزَۢا ٩٨﴾ [مريم: ٩٨]

“আমি কুরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দেন এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন।” আল-কুরআন, সূরা মরিয়ম : ৯৮।

‘হারবূল বাসুস’ নামে সমধিক পরিচিত।[50] তাদের সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا﴾ [آل عمران: ١٠٣]

“তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু ছিলে, অতঃপর আমি তোমাদের অন্তরে বন্ধুত্বের ভাব সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম। ফলে তোমরা পরস্পরে ভাই-ভাই হয়ে গেলে।”[51]

তাদের মাঝে জাহেলী প্রতিশোধ স্পৃহা, ক্রোধ, গোত্রপ্রীতি চরমভাবে বিদ্যমান ছিল।

ইয়াহূদী ধর্মের অনুসারীদের ছিল আকাশ ছোয়া অহংকার। ইয়াহূদী পুরোহিতরা আল্লাহ তা‘আলাকে বাদ দিয়ে নিজেরাই প্রভু হয়ে বসেছিল। তারা মানুষের উপর নিজেদের ইচ্ছা জোর করে চাপিয়ে দিত। তারা মানুষের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যাণ-ধারণা এবং মুখের কথা নিজেদের মর্জির অধীন করে দিয়েছিল। ধর্ম নষ্ট করে হলেও তারা

---

[50] ইবনুল আছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯২-২৯৫।

[51] আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান : ১০৩।

ক্ষমতা ও ধন-সম্পদ পেতে চাইত। অপরদিকে খ্রিষ্ট ধর্ম ছিল এক উদ্ভট মূর্তিপূজার ধর্ম। তারা আল্লাহ তা'আলা এবং মানুষকে বিস্ময়করভাবে একাকার করে দিয়েছিল। আরবের যে সব লোক এ ধর্মের অনুসারী ছিল, তাদের উপর এ ধর্মের প্রকৃত কোনো প্রভাব ছিল না। কেননা দীনের শিক্ষার সাথে তাদের ব্যক্তি জীবনের কোনো মিল ছিল না। কোনো অবস্থায়ই তারা নিজেদের ভোগ সর্বস্ব জীবন-যাপন পরিত্যাগ করতে রাজি ছিল না। পাপের পথে নিমজ্জিত ছিল তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন।

আরবের অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের জীবনও ছিল পৌত্তলিকদের মতো। কেননা তাদের ধর্মের মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও মনের দিক থেকে তারা ছিল একই রকম। তাদের পারস্পরিক জীবনাচার এবং রুসম-রেওয়াজের ক্ষেত্রও এক ও অভিন্ন ছিল।[52]

---

[52] আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।

খ. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মক্কী জীবন

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য বহু নবী-রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। আর আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মক্কার জীবন ছিল স্নেহ, মায়া-মমতা ও ভালবাসায় ভরপুর। এই মক্কার জীবনের শেষের দিকে তাঁর প্রতি যুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন নেমে আসে। এত অত্যাচারের পরেও তিনি মক্কাবাসিদের প্রতি বিরুপ ভাবাপন্ন হন নি বরং তাদের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল। সুদীর্ঘ ৫২ বছর তিনি মক্কায় অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই তাঁর জীবনের অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম:

রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা নগরীতে সম্ভ্রান্ত কুরাইশ গোত্রের হাশেমী শাখায় জন্মগ্রহণ করেন।[53] অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তিনি ৯ই রবিউল আউয়াল সোমবার প্রাতঃকালে জন্মগ্রহণ করেন।[54] আর এ বছরটি ছিল আমুল ফীল[55] অর্থাৎ হাতীবাহিনী নিয়ে আবরাহার কা'বা অভিযানের ঘটনার বছর।[56] যে বছর আসহাবে ফীল বায়তুল্লাহর উপর আক্রমণ চালনা করে এবং মহান আল্লাহ তাদেরকে আবাবীল অর্থাৎ কতিপয় ক্ষুদ্র পাখি দ্বারা পরাস্ত করেন, যার

---

[53] মুহাম্মদ রেযা, মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বৈরুত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, তা.বি, পৃ. ১২; ইবন সা'দ, আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, দারুল কুতুবুল ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্কারণ, ১৯৯০/১৪১০,), পৃ. ৮০-৮১।

[54] সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর রাহীকুল মাখতুম, বৈরুত: দারুল মাওয়িদ, ১৯৯৬/১৪১৬, পৃ. ৫৪।

[55] আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১।

[56] শামসুদ্দিন আযযাহাবী, সিয়ার আলাম আন নুরালা, ১ম খণ্ড, বৈরুত: মুয়াস্সাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬/১৪১৭), পৃ. ৩৫।

সংক্ষিপ্ত ঘটনা কুরআন মাজীদেও বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত ফীলের ঘটনাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মের বরকতের সূচনা ছিল। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে সোমবার দিনে তাঁর জন্ম অবিসংবাদিত। কারণ তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, আর এ অভিমতটি অধিকাংশ সীরাত লেখকের।

কোনো কোনো আলেম বলেন, ঈসায়ী সাল অনুযায়ী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৫৭১ খৃষ্টাব্দে ২০ শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন।[57]

মুহাম্মদ রেদার মতে ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন।[58]

সৈয়দ আমীর আলী বলেন, ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[59]

---

[57] আর রাহীকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা ৫৪।

[58] মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ, পৃ. ১২।

জন্মস্থান হলো মক্কার হারাম এলাকার ঐ জায়গাটুকু যা পরে হাজ্জাজের ভাই মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আল-সাকাফীর অধীনে আসে।[60]

নাম ও বংশ-পরিচয়:

মা আমিনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম রাখলেন 'আহমাদ'। এর অর্থ চরম প্রশংসাকারী। আর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর পৌত্র সর্বকালের প্রশংসিত হওয়ার আশায় তাঁর নাম রাখলেন 'মুহাম্মাদ' বা চরম প্রশংসিত।

পিতার নাম আব্দুল্লাহ। পিতার দিক থেকে বংশ তালিকা হল- মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবন আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদ মানাফ ইবন কুশাই ইবন কিলাব ইবন মুররাহ ইবন কা'ব ইবনে লুয়াই ইবন গালিব ইবন ফিহর ইবন মালিক ইবন

---

[59] সৈয়দ আমীর আলী, দি স্পিরিট অব ইসলাম, অনুবাদ: অধ্যাপক মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৩/১৪১৩), পৃ. ৫৫।

[60] মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ, পৃ. ১২।

কিনানা ইবন খুযাইমা ইবন মুদরিকা ইবন ইলিয়াস ইবন মুযার ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনান ইবন উদ।[61] এ পর্যন্ত বংশানুক্রম সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত। এখান থেকে আদম 'আলাইহিস সালাম পর্যন্ত বংশ পরিক্রমায় মতভেদ রয়েছে।

মাতার নাম আমিনা। মাতার দিক থেকে তাঁর বংশপরিক্রমা হল- মুহাম্মদ ইবন আমিনা বিনত ওয়াহাব ইবন আবদ মানাফ ইবন যুহরা ইবন কিলাব।[62]

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কিলাব ইবন মুররাহ পর্যন্ত পৌছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতা-মাতার বংশ এক হয়ে গেছে।

দুধ পান ও শৈশবকাল:

---

[61] ইবন হিশাম, আস সীরাতুন নাবুবিয়্যাহ, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৪/১৪১৫), পৃ. ৩-৫।

[62] আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম তাঁর মা আমিনার দুধ পান করেন। এরপর আবু লাহাবের দাসী সুওয়াইবা কয়েক দিন দুধ পান করান। আরবের অভিজাত বংশের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাঁর দুগ্ধপানের ভার হাওয়াযিন বংশের সা'দ গোত্রের এক ধাত্রী হালীমা বিনত আবু যুয়ায়ব-এর উপর ন্যস্ত হয়।[63] কারণ পাশ্ববর্তী অঞ্চলে পাঠানোর ফলে শারীরিক অবস্থাও ভাল হতো এবং তারা খাটি আরবী ভাষা শিখতেও সক্ষম হতো।

হালীমা সা'দিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি তায়েফ হতে বনী সা'দের মহিলাদের সাথে দুগ্ধপোষ্য শিশুর খোঁজে মক্কায় আসি। ঐ বছর দুর্ভিক্ষ ছিল। আমার কোলেও এক শিশু ছিল। কিন্তু দারিদ্র ও অনাহারের ফলে তার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দুধ আমার ছিল না।

[63] মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ, পৃ. ১৭।

সারা রাত সে দুধের জন্য চিৎকার করতো এবং আমি তার জন্য সারারাত বসে বসে কাটাতাম। আমাদের একটি উটনী ছিল, কিন্তু এটারও দুধ ছিল না।

মক্কায় সফরে তিনি যে খচ্চরের উপরে আরোহণ করেছিলেন, এটাও এত দুর্বল ছিল যে, সবার সাথে এটা চলতে সক্ষম ছিল না। সাথীরাও এতে বিরক্ত হয়ে যেতন। অবশেষে অতিকষ্টে এ ভ্রমণ শেষ হয়। মক্কায় পৌছে সে রাসূলকে দেখে এবং শোনে যে, তিনি ইয়াতীম। তখন কেউই তাকে গ্রহণ করতে রাযী ছিল না। এদিকে হালীমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। তাঁর দুধের স্বল্পতা তাঁর জন্য রহমত হয়ে গেল। কেননা দুধের স্বল্পতায় কেউ তাঁকে আপন শিশু প্রদান করতে চায়নি।

হালীমা বর্ণনা করেন, "আমি আমার স্বামীর সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেই যে, শূন্য হাতে ফিরে যাওয়ার চেয়ে উত্তম হলো এ শিশুকেই নিয়ে যাই।"

স্বামী রাজি হলেন এবং এ মানিক্য রতন ইয়াতীমকে ঘরে নিয়ে এলেন, যাঁর জন্য কেবলমাত্র হালীমা ও আমিনার ঘরই নয়, বরং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তথা বিশ্বই আলোকোজ্জ্বল হয়ে যাচ্ছিল। আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো এবং রাসূল তাঁদের কোলে এলেন। তাঁবুতে এসে তিনি শিশুকে দুধ পান করাতে বসলেন আর সাথে সাথেই বরকত ও রহমত প্রকাশ হতে লাগল। এত পরিমাণ দুধ নির্গত হল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর দুই-ভাই একান্ত তৃপ্তির সাথে পান করে ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে উটনীর দিকে চেয়ে তিনি দেখতে পান যে, এর দুধের স্তর পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

আমার স্বামী দুধ দোহন করলেন এবং আমরা তৃপ্তির সাথে পান করে সারা রাত আরামে কাটালাম। দীর্ঘ দিন পর এটাই প্রথম রাত, যে রাতে আমরা শান্তির সাথে ঘুমিয়েছিলাম।[64]

---

[64] মুফতী মুহাম্মদ শফী রাদিয়াল্লাহু আনহু, সীরাতু খাতিমিল আম্বিয়া, অনুবাদ: মুহাম্মদ সিরাজুল হক (ঢাকা: ইফাবা: তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭/১৪০৭), পৃ.৫।

দু’ বছর বয়সে স্তন্যদান বন্ধ করার পর হালীমা তাঁর মায়ের কাছে প্রত্যাবর্তনের জন্য তাঁতে মক্কায় নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু মক্কায় মহামারী দেখা দেয়ায় তিনি তাঁকে আরো কিছুদিনের জন্য নিয়ে আসলেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সংস্পর্শে হালীমার শারীরিক এবং পারিবারিক প্রবৃদ্ধি লাভ হয়েছিল। হালিমার গৃহে থাকাকালে তাঁর কতক চরিত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় হয়েছিল। তার ছেলে-মেয়ের সাথে শিশু মুহাম্মদও ছাগল ও মেষ চরাতে যেতেন। একদা তিনি দুধ-ভাই আব্দুল্লাহর সাথে পশু চরাচ্ছিলেন। হঠাৎ আব্দুল্লাহ হাপাতে হাপাতে বাড়ি ছুটে এলো এবং আমাকে ও তার পিতাকে বলল, ঐ কুরাইশী ভাইটাকে সাদা কাপড় পরা দুজন লোক এসে শুইয়ে দিয়ে পেট চিরে ফেলেছে এবং পেটের সবকিছু বের করে নাড়াচাড়া করছে। এ কথা শুনে আমি ও আমার স্বামী তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবর্ণ মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা উভয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম এবং বললাম, বাবা তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আমার কাছে

সাদা কাপড় পরিহিত দু ব্যক্তি এসে আমাকে শুইয়ে আমার পেট চিরল। তারপর কি যেন একটা জিনিস তন্ন তন্ন করে খুঁজছিল। আমি জানি না জিনিসটা কি। এরপর আমরা মুহাম্মদকে সাথে নিয়ে বাড়িতে চলে আসলাম।[65]

হালীমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমার স্বামী বললেন, আমার মনে হয় এ ছেলের উপর কোন কিছুর আছর হয়েছে। সুতরাং কোন ক্ষতি হওয়ার আগেই তাঁতে তার পরিবারের কাছে পৌঁছে দাও। অতঃপর আমরা তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে আসলাম এবং তাঁর কাছে সোপর্দ করলাম। তখন তাঁর মা হালীমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এত আগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এত শীঘ্র ফেরত দেওয়ার কারণ কি? বারবার জিজ্ঞেস করার পর হালিমা সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি তা শুনে বললেন, নিশ্চয় আমার পুত্রের কোন বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। অতঃপর তিনি

---

[65] শাইখ মুহাম্মদ খুদরী বেগ, নূরুল ইয়াকীন ফি সীরাতে সায়্যেদিল মুরসালিন (দিল্লী: কুতুব খানাই ইশাআতুল ইসলাম, তা.বি), পৃ. ৭; মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃ. ১৯, আস সিরাতুন নবুবিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫।

গর্ভধারণের দিনগুলোর ও জন্মের সময়ের আশ্চর্য ঘটনা বর্ণনা করলেন। মা আমিনা ধাত্রী হালিমাকে বললেন, তুমি মুহাম্মদকে রেখে নির্দ্বিধায় চলে যেতে পার।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স যখন ছয় বছর, তখন তাঁর মাতা আমিনা তাঁকেসহ তাঁর পিতার কবর যিয়ারত করার জন্য ইয়াসরিবে গমন করেন। অতঃপর মক্কায় ফেরত পথে আবওয়া নামক স্থানে আমিনা মারা যান। সফরসঙ্গী পরিচারিকা উম্মে আয়মান ইয়াতীম মুহাম্মাদকে মক্কায় দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে অর্পণ করেন।[66]

মা আমিনার মৃত্যুর পর শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লালন পালনের দায়িত্ব দাদা আব্দুল মুত্তালিব গ্রহণ করলেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাদার সাথেই অবস্থান করতে থাকেন। কাবা শরীফের পার্শ্বেই আব্দুল মুত্তালিবের

---

[66] সিয়ারু 'আলামিন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪; মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ, পৃ. ২২; আস সীরাতুন নবুবিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৮।

জন্য বিছানা পেতে রাখা হত এবং তাঁর পুত্ররা সকলে তার সেই বিছানার চারপাশে বসতো। তিনি যতক্ষণ বের না হতেন ততক্ষণ তারা স্থির হয়ে বসে থাকতেন এবং তার মর্যাদার খাতিরে কেউ তার বিছানার উপর বসতো না। এই সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আসতেন। তখন তিনি সুদর্শন কিশোর। তিনি সে বিছানার উপর বসে পড়তেন। তাঁর চাচাগণ তাঁকে ধরে সরিয়ে দিতে গেলেই আব্দুল মুত্তালিব তাদেরকে বলতেন, আমার সন্তানকে ছেড়ে দাও। আল্লাহর কসম, সে নিশ্চয়ই সম্মানিত। তারপর তাতেই তিনি আনন্দিত হতেন। রাসূলের জন্মের আট বছর পর আব্দুল মুত্তালিব মারা যান।[67]

দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তাঁর চাচা আবু তালিবের নিকট শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লালিত-পালিত হতে লাগলেন। স্নেহময় চাচার সর্তক দৃষ্টিতে তিনি ক্রমান্বয়ে বড় হতে লাগলেন। যখন তাঁর বয়স দশ বছর তখন

---

[67] আস সীরাতুন নবুবিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৮।

তিনি ছাগল ও মেষ চরাতেন। তখন আরবদেশে মেষ চরানো অপমানজনক কাজ বলে বিবেচিত হতো না। আবু তালিব বাণিজ্য করতেন। কুরাইশদের প্রথা ছিল যে, তারা প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে একবার শামদেশ এবং শীতকালে ইয়েমেন যেত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স যখন বার বছর তখন তিনি চাচার সাথে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় গমন করেন এবং সফরের এক পর্যায়ে বুসরায় গিয়ে উপস্থিত হন। উক্ত শহরে জারজিস নামক একজন খ্রিষ্টান ধর্মযাজক (রাহেব) বসবাস করতেন। তার উপাধি ছিল বুহায়রা। এ উপাধিতেই তিনি সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। মক্কার ব্যবসায়ী দল যখন বসরায় শিবির স্থাপন করেন, তখন রাহেব গির্জা থেকে বেরিয়ে তাদের নিকট আগমন করেন এবং আতিথেয়তায় আপ্যায়িত করেন। অথচ এর পূর্বে তিনি গির্জা থেকে বের হয়ে কোনো বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি। তিনি কিশোর নবীর আচার-আচরণ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখে বুঝতে পারেন যে, ইনিই হচ্ছেন বিশ্বমানবের মুক্তির দিশারী আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতঃপর কিশোর

নবীর হাত ধরে তিনি বলেন যে, ইনিই হচ্ছেন বিশ্বজাহানের সরদার। আল্লাহ তাঁকে বিশ্বজাহানের রহমত রূপী রাসূল মনোনীত করবেন। আবু তালিব বললেন, আপনি কিভাবে অবগত হলেন যে, তিনিই হবেন আখিরী নবী?

বুহায়রা বললেন, গিরিপথের ঐ প্রান্ত থেকে তোমাদের আগমন যখন ধীরে ধীরে দৃষ্টগোচর হয়ে আসছিল আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, সেখানে এমন কোনো বৃক্ষ কিংবা প্রস্তরখণ্ড ছিল না, যা তাকে সিজদা করে নি। এ সমস্ত জিনিস নবী-রাসূল ছাড়া সৃষ্টিরাজির অন্য কাউকে কখনই সিজদা করে না।[68] তারপর তিনি তাঁর পিঠে দেখলেন। পিঠে দুই কাঁধের মাঝখানে নবুয়তের মোহর অংকিত দেখতে পেলেন। মোহরটি অবিকল সেই জায়গায় দেখতে পেলেন, যেখানে বুহায়রার পড়া আসমানী কিতাবের বর্ণনা অনুসারে থাকার কথা ছিল। ইবন হিশাম বলেন, "মোহরটি দেখতে ঠিক শিংগা লাগানোর যন্ত্রের অংকিত চিহ্নের মত বৃত্তাকার ছিল।" ইবন ইসহাক বলেন, "বুহায়রা তার চাচাকে জিজ্ঞাসা

---

[68] আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ৫৮-৫৯।

করলেন এ বালকটি আপনার কে? তিনি বললেন, আমার ছেলে। বুহায়রা বললেন, সে আপনার ছেলে নয়। এই ছেলের পিতা জীবিত থাকার কথা নয়।”

আবু তালিব বললেন, সে আমার ভাই-এর ছেলে। বুহায়রা বললেন, ওর পিতার কি হয়েছিল? আবু তালিব বললেন, এই ছেলে মায়ের পেটে থাকতেই তার পিতা মারা গেছে। বুহায়রা বললেন, “এ রকমই হওয়ার কথা। আপনি আপনার ভাতিজাকে নিয়ে দেশে ফিরে যান। খবরদার, ইয়াহুদীদের থেকে ওকে সাবধানে রাখবেন। আল্লাহর কসম, তারা যদি এই বালককে দেখতে পায় এবং আমি তার যে নির্দশনাবলী দেখে চিনেছি, তা যদি চিনতে পারে তাহলে ওরা ওর ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করবে। কেননা আপনার এ ভাতিজা ভবিষ্যতে এক মহামানব হিসেবে আবির্ভূত হবেন।” তারপর আবু তালিব তাকে নিয়ে স্বদেশে ফিরে গেলেন।[69]

---

[69] আস সীরাতুল নবুবিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬-১৫৭।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স যখন চৌদ্দ, মতান্তরে পনের বছর তখন "ফুজ্জার যুদ্ধ" সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে এক পক্ষে ছিলেন কুরাইশগণ এবং তাদের মিত্র বনু কিনানা। বিপক্ষে ছিলেন কায়েস আয়লান। কুরাইশ কিনানা মিত্র পক্ষের সেনাপতি ছিলেন হরব ইবন উমাইয়া। কারণ স্বীয় প্রতিভা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে তিনি কুরাইশ ও কিনানা গোত্রের মধ্যে নিজেকে মান-মর্যাদার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। একে ফুজ্জার যুদ্ধ এ জন্যই বলা হয় যে, এতে নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ এবং পবিত্র মাসের পবিত্রতা উভয়ই বিনষ্ট করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কৈশোরান্তিক বয়ক্রমকালে এই যুদ্ধে গমন করেছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি তীরের আঘাত থেকে তাঁর চাচাদের রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আমার চাচাগণের দিকে শত্রুদের ছুড়ে মারা তীর ও বর্শাগুলো কুড়িয়ে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিতাম।[70]

---

[70] আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ৫৯।

হরবুল ফুজ্জারের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ হারাম মাসগুলোর যিলকদ মাসে হিলফুল ফুযুল গঠিত হয়।[71] ফুজ্জার থেকে প্রত্যাবর্তন করে কুরাইশরা এ সংগঠনটি গঠন করেন। আর ইহা ছিল একটি উত্তম প্রতিজ্ঞা। এ বৈঠকে যে গোত্রগুলো অংশগ্রহণ করে, তারা হলো কুরাইশ, বনু হাশিম, বনু মুত্তালিব, বনু আসাদ, বনু যোহরা এবং বনু তামীম। বৈঠকে একত্রিত হয়ে সকলে যাবতীয় অন্যায়- অত্যাচার এবং অর্থহীন যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করেন।

আলোচ্য পরামর্শ সভায় এটা স্থির হয় যে, এ জাতীয় নীতি হচ্ছে ভয়ংকর অন্যায়, অমানবিক ও অবমাননাকর।[72]

কাজেই এ ধরনের জঘন্য নীতি আর কিছুতেই চলতে দেয়া যায় না। তারা প্রতিজ্ঞা করলেন:

---

[71] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

[72] মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ, পৃ. ৩৫; আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩; ইয়াকুবী, তারিখুল ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, (বৈরুত: দারুল সদর, তা.বি), পৃ. ১৭।

ক. দেশের অশান্তি দূর করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

খ. বিদেশী লোকদের ধন প্রাণ ও মান-সম্ভম রক্ষা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

গ. দরিদ্র, দুর্বল ও অসহায় লোকদের সহায়তা দানে আমরা কখনই কুণ্ঠাবোধ করব না।

ঘ.অত্যাচারী ও অনাচারীর অন্যায়-অত্যাচার থেকে দুর্বল দেশবাসীদের রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব।[73]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পিতৃব্য যুবাইর ইবন আব্দুল মুত্তালিব উক্ত আলোচনা বৈঠকে যোগদান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে যুবক নবীই ছিলেন যে কল্যাণমুখী চিন্তা-ভাবনার উদ্ভাবক এবং পিতৃব্য যুবাইর ছিলেন প্রথম সমর্থক। তাদের উভয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই ক্রমে ক্রমে

[73] আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ৬০।

সমর্থক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আব্দুল্লাহ ইবন জুদ'আনের গৃহে বিভিন্ন গোত্রপতির উপস্থিতি ও সম্মতি সাপেক্ষে অঙ্গীকারনামা সম্পাদিত হয় এবং তার ভিত্তিতেই সেবা-সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারনামা। এ জন্য এ অঙ্গীকারনামা ভিত্তিক সেবা সংঘের নাম দেয়া হয়েছিল হিলফুল ফুযুল।[74] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

"আমি অঙ্গীকারের সময় আব্দুল্লাহ ইবন জুদআনের গৃহে উপস্থিত ছিলাম। এর বিনিময়ে লাল বর্ণের উট দিলেও আমি গ্রহণ করতে রাযী নই। আজও যদি অনুরূপ অঙ্গীকারের জন্য আহূত হই আমি নিশ্চয়ই উপস্থিত হব।"[75]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন ধনী বণিকের কর্মচারী বা প্রতিনিধি হিসেবে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদেশে

---

[74] নূরুল ইয়াকীন, পৃ. ১১।

[75] ড. ওসমান গনি, মহানবী (কলিকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯১), পকৃ. ১০৬।

বাণিজ্য উপলক্ষে গমন করেন। এই সমস্ত যাত্রাগুলোতে তাঁর মানবিক ব্যবহার ও বাণিজ্য লেনদেন সম্পর্কে তাঁর চারিত্রিক সততা এতই উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসিত হয় যে, তাঁকে সকলেই দ্বিধাহীনভাবে আল আমীন অর্থাৎ চিরবিশ্বাসী নামে অভিহিত করতে থাকেন। জীবনের যে কোনো অবস্থাতেই তিনি কথার খেলাফ করেন নি। তাই বিভিন্ন দিক থেকে সমগ্র আরববাসীর নিকট তার চরিত্রের সাধুতা সন্দেহের বহু উচ্চে স্থান লাভ করে। সমগ্র আরব জগতে ছোট-বড় বৃদ্ধ সকলেই যে কোন বিষয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতো।[76]

ইবন ইসহাক বলেন, খাদীজা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য মহিলা ছিলেন। তিনি বেতনভুক্ত কর্মচারী রেখেও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। বস্তুত পক্ষে গোটা কুরাইশ বংশই ছিল ব্যবসাজীবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক মহত্ত্বের সুখ্যাতি অন্যদের ন্যায় খাদীজারও গোচরীভূত হয়। তাই তিনি তাঁর কাছে

[76] আস সীরাতুন নাবুবিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬১-১৬২; মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, পৃ. ৩৭।

লোক পাঠিয়ে তাঁর পণ্য-সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া যাওয়ার প্রস্তাব দেন। তিনি তাঁকে এও জানান যে, এ কাজের জন্য তিনি অন্যদেরকে যা দিয়ে থাকেন তার চেয়ে উত্তম সম্মানী তাঁকে দিবেন। খাদীজা তাঁর গোলাম মায়সারাকেও তাঁর সাহায্যের জন্য সঙ্গে দিতে চাইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং খাদীজার পণ্য-সামগ্রী নিয়ে ভৃত্য মায়সারাসহ সিরিয়া অভিমূখে যাত্রা করলেন। সিরিয়ায় পৌছে তিনি জনৈক ধর্মযাজকের গির্জার নিকটবর্তী এক গাছের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। এক সময় সেই ধর্মযাজক মায়সারাকে নিভৃতে নিজ্ঞাসা করলেন, এই গাছের নিচে বিশ্রামরত ভদ্রলোকটি কে? সে বলল, তিনি কাবা শরীফের কাছেই বসবাসকারী জনৈক কুরায়শ। ধর্মযাজক বললেন, “এই গাছের নিচে নবী ছাড়া আর কেউ এখন বিশ্রাম নেয় নি।”

বাণিজ্যের কার্য সম্পাদন পূর্বক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে মায়সারাকে সাথে নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। মক্কায় পৌছে তিনি

খাদীজাকে তাঁর ক্রয় করা মালপত্র বুঝিয়ে দিলেন। খাদীজা ঐ মাল বিক্রয় করে দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করলেন। এ দিকে মায়সারাকে যাজক যা যা বলেছিল তা সে খাদীজার নিকট হুবহু বিবৃত করলো।[77]

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবাহ

খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বসম্পন্না, প্রখর বুদ্ধিমতী, বোধশক্তিসম্পন্না, আত্মমর্যাদাসম্পন্না ও অতি উচ্চ বংশীয় মহীসয়ী মহিলা। নবীর মহত্ব ও সততার সাথে পরিচিত হওয়া তাঁর জন্য একটা অতিরিক্ত সৌভাগ্য হয়ে দেখা দিল। বলা বাহুল্য, এটা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুগ্রহের ফল। মায়সারার উক্ত অলৌকিক ঘটনা শুনে খাদীজা এত অভিভূত হলেন যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে নিম্নরূপ বার্তা পাঠালেন, “ভাই আপনার গোত্রের মধ্যে আপনার যে মর্যাদাপূর্ণ

---

[77] আস সীরাতুল নবুবিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬-১৫৭।

অবস্থান, যে আত্মীয়তার বন্ধন এবং সর্বোপরি আপনার বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতার যে সুনাম রয়েছে, তাতে আমি মুগ্ধ ও অভিভুত।” এ বলে খাদীজা তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কুরাইশদের মধ্যে তখন খাদীজা ছিলেন ধনে-মানে, মর্যাদায় ও বংশীয় আভিজাত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা। তাঁর গোত্রে এমন কোন পুরুষ ছিল না, যে তাকে সাধ্যে কুলালে বিয়ে করা অভিলাষ পোষণ করতো না। খাদীজার পিতার নাম খুওয়ায়লিদ এবং মাতার নাম ফাতিমা। পিতামাতা উভয়েই পূর্বপুরুষ লুওয়াইতে গিয়ে একই প্রজন্মে মিলিত হয়েছেন।[78]

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজার প্রস্তাব চাচাদের কাছে পেশ করলেন। চাচা হামযা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সাথে নিয়ে তৎক্ষণাৎ খাদীজার পিতার কাছে চলে গেলেন। তার সাথে দেখা করে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব দিলেন। নির্ধারিত দিনে বিবাহ অনুষ্ঠানে আবু তালিব বনু হাশিম এবং মুদের বংশের সর্দারগণ খাদীজার গৃহে সমবেত

---

[78] প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২; মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ, পৃ. ৩৮।

হলেন। আবু তালিব বিবাহের খুতবা পাঠ করেন। এ খুতবায় তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যে সমস্ত কথাবার্তা বলেছেন তা উল্লেখ্যযোগ্য।

আবু তালিব বলেন, “ইনি মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ। যদিও তিনি ধন-সম্পদে কম, কিন্তু ভদ্র, চরিত্র ও উচ্চ মর্যাদার কারণে যে ব্যক্তিকেই প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রাখা যাক না কেন, পরিণামে তিনিই হবেন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কেননা ধনদৌলত ধ্বংসশীল, ছায়া স্বরূপ এবং ক্ষীয়মান বস্তু। ইনি মুহাম্মদ, যার আত্মীয়তা সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন, খাদীজা বিনত খুয়ায়লিদের সাথে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ করতে চাই। তার সমস্ত মোহরে মু‘আজ্জাল (তাৎক্ষণিক আদায়কৃত) মোহরে মুয়াজ্জাল (বিলম্বে পরিশোধযোগ্য) আমার সম্পদ হতে আদায়কৃত এবং আল্লাহর শপথ, এরপর তাঁর মান-সম্মান ও প্রভাব অনেক গুণ বেড়ে যাবে।”[79]

---

[79]মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ, পৃ. ৩৮।

ইবন হিশাম বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহধর্মিণী খাদিজাকে মোহরানা স্বরূপ ২০টি তরুণ উট প্রদান করেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স ছিল ২৫ বছর। আর খাদীজার বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। খাদীজাই ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রথম স্ত্রী এবং তাঁর জীবদ্দশায় তিনি আর কোন বিবাহ করেন নি।

খাদীজার গর্ভে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাসিম, তাহির, তায়্যিব, যয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা-এই কজন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। একমাত্র ইব্রাহীম ছাড়া তাঁর সকল সন্তানই খাদীজার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কাসিমের নাম অনুসারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবুল কাসিম নামেও খ্যাত হন। কাসিম, তায়্যিব, তাহির জাহিলিয়ার যুগেই মারা যান। কিন্তু মেয়েরা সবাই ইসলামের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেন এবং সবাই ইসলাম গ্রহণ করে পিতার সঙ্গে হিজরত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন কাসিম। তারপর ক্রমান্বয়ে তায়্যিব, তাহির, কন্যা

রুকাইয়া, যয়নব, উম্মে কুলসুম ও সর্বশেষে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অপর এক সন্তান ছিলেন ইব্রাহীম। ইনি মারিয়্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মিসরের খ্রিষ্টান শাসক মুকাওকিস মারিয়্যাকে উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন।[80]

কাবা গৃহ সংস্কার ও হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কিত বিবাদ মীমাংসা:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পয়ত্রিশ বছরে পদার্পণ করেন, তখন কুরাইশগণ কাবা গৃহের পুনঃনির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন। কারণ ছিল এই যে, কাবা গৃহের স্থানটি চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিল মাত্র। দেয়ালের উপর কোনো ছাদ ছিল না। এই অবস্থায় কিছু সংখ্যক চোর এর মধ্যে প্রবেশ করে রক্ষিত বহু মূল্যবান সম্পদ এবং অলংকারাদি চুরি করে নিয়ে যায়। ইসমাইলের আমল হতেই এই ঘরের উচ্চতা ছিল ৯ হাত।

---

[80] আস সীরাতুল নবুবিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬-১৫৭।

গৃহটি বহু পূর্বে নির্মিত হওয়ার কারণে দেয়ালগুলোতে ফাটল সৃষ্টি হয়ে যে কোন মুহূর্তে তা ভেঙ্গে পড়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তা ছাড়া সেই বছরের প্লাবনে দেওয়ালের চরম অবনতি ঘটে এবং যে কোন মুহূর্তে তা ধসে পড়ার আশংকা ঘণীভূত হয়ে ওঠে। এমনিভাবে এক নাজুক অবস্থার প্রেক্ষাপটে কুরাইশগণ সংকল্পবদ্ধ হলেন কাবা গৃহের স্থান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে তা পুনঃনির্মাণের জন্য।[81]

কাবাগৃহ নির্মাণে অংশগ্রহণকে সবাই নিজকে সৌভাগ্যবান এবং এটাকে নেক কাজ মনে করতেন। কুরাইশ গোত্র নিজেদের উপর ফায়সালা করে রেখেছিল যে, এর নির্মাণ কাজে তারা সিংহভাগ অংশ পাবে। তাই এ নির্মাণ কাজ সমস্ত গোত্রের মধ্যে বন্টন করার ব্যবস্থাপনা করতে হলো, যাতে কোন বিবাদ সৃষ্টি না হয়।

[81] আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ৬১; সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা; ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩-৬৪।

কাবা নির্মাণ বণ্টনের কাজ ক্রমান্বয়ে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌছালো। কিন্তু তার স্থাপনের ব্যাপারে মতানৈক্য শুরু হলো। প্রত্যেক গোত্র এবং প্রত্যেকেরই কামনা ছিল যে, তারাই এ পূণ্য অর্জন করবে। ফলে ঘটনাটি এতদূর পর্যন্ত পৌছে গেল যে, তারা মারামারি, কাটাকাটির জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে লাগলো। জাতির কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রস্তাব করলেন যে, পরামর্শ করে কোন সন্ধির পথ বের করা হোক। এ উদ্দেশ্যে সবাই মসজিদে একত্রিত হলেন।

পরামর্শ সভায় সিদ্ধান্ত হলো যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম মসজিদের এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেন তিনিই এ ব্যাপারে মীমাংসা করবেন এবং তাঁর নির্দেশকে কুদরতী নির্দেশ বলে মেনে নিতে হবে। মহান আল্লাহর কুদরতে সর্বপ্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন।[82] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এভাবে আসতে দেখে সকলেই চিৎকার করে বলে উঠল:

---

[82] সীরাতু খাতিমিল আম্বিয়া, পৃ. ২৩; প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪।

ইনিই আল আমীন। আমরা সবাই তাঁর উপর সন্তুষ্ট। ইনিই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের নিকটবর্তী হন, তখন ব্যাপারটি সবিস্তারে তাঁর নিকট পেশ করা হল। তখন তিনি একখানা চাদর চাইলেন। চাদর দেওয়া হলে মেঝের উপর তা বিছিয়ে দিয়ে স্বহস্তে কৃষ্ণ প্রস্তরটি তার উপর স্থাপন করলেন এবং বিবাদমান গোত্রপতিদেরকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, আপনারা সকলে একসাথে মিলে চারদটি ধরুন এবং কৃষ্ণ প্রস্তরটি বহন করে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে চলুন। অতঃপর স্বহস্তে তিনি কৃষ্ণ প্রস্তরটি উঠিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলেন। এ মীমাংসা সবাই খুশীমনে মেনে নিলেন। অত্যন্ত সহজ সরল সুশৃঙ্খল এবং সঙ্গত পন্থায় জ্বলন্ত একটি সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিরপেক্ষতা এবং তীক্ষ্ণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে সকলেই স্তম্ভিত হল এবং আসন্ন সমরাশংকা তিরোহিত হল।[83]

---

[83] আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ৬২; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, (ঢাকা: ই.ফা.বা

হেরাগুহায় ধ্যান ও নবুয়ত লাভ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হতে নিভৃতে চিন্তা ধ্যানের জন্য মক্কা হতে তিন মাইল দূরে হেরা নামক পর্বত গুহায় যেতে আরম্ভ করলেন। কয়েকদিনের খাদ্য-পানীয় সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তা শেষ হলে বাড়িতে এসে আবার কয়েকদিনের জন্য খাদ্য পানীয় নিয়ে চলে যেতেন। খাদীজা পরম যত্ন সহকারে আহার্য প্রস্তুত করে দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্জনাসক্তি ও নির্জনতায় ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। কিছুদিন যাবত তিনি একটি স্বর্গীয় আলোক দেখতে এবং একটি অশ্রুপূর্ণ শব্দ তরঙ্গ শুনতে পেলেন। তখন থেকে তিনি স্বপ্নযোগে যা দেখতেন তাই সত্যে পরিণত হতে লাগল।[84] অবশেষে তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন একদিন

১৯৮২/ ১৪০২), পৃ. ২৯৩।

[84] সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, (ঢাকা: ই.ফা.বা ১৯৮২/ ১৪০২), পৃ. ২৯৫।

প্রকাশ্যে মহান আল্লাহ তাঁকে প্রকাশ্যে ও বাহ্যিক নবুয়তের পরম মর্যাদায় ভূষিত করলেন।[85]

তখন ছিল রমযান মাস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রেখে রাত্রিতে হেরা গুহায় সারারাত জাগ্রত থেকে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। এমনিভাবে রমযানের ২১ হতে ২৯ তারিখের কোনো এক বিজোড় রজনীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন তখন মহান আল্লাহর দূত জিবরাঈল 'আলাইহিস সালাম তাঁর নিকট আগমন করেন। এ ঘটনাটি হাদীসের মাধ্যমে বর্ণনা করলেও অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আয়িশা রাদিয়াল্লাহ 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথমে যে ওহী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসত তা হল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্ন। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা ভোরের আলোর মতই স্পষ্ট হতো। এরপর তাঁর নিকট নির্জন জীবন যাপন ভাল লাগলো। তাই তিনি একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত নিজ পরিবারের নিকট না গিয়ে হেরা গুহায় নির্জন পরিবেশে

[85] সীরাতু খাতিমিল আম্বিয়া, পৃ. ২৩।

আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতে লাগলেন। আর এ উদ্দেশ্যে তিনি কিছু খাবার সাথে নিয়ে যেতেন। পরে তিনি বিবি খাদীজার নিকট ফিরে এসে আবার ঐরূপ কয়েকদিনের জন্য খাবার নিয়ে যেতেন। এভাবে হেরা গুহায় থাকাকালে তাঁর নিকট সত্য ওহী এলো। জিবরাঈল ফেরেশতা সেখানে এসে তাঁকে বললেন, পড়ুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফেরেশতা তখন আমাকে ধরে এত জোরে আলিঙ্গন করলেন যে, এতে আমি চরম কষ্ট অনুভব করলাম। এরপর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন। আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। তখন তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার আমাকে ধরে খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। তাতে আমার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হলো। এরপর আমাকে তিনি ছেড়ে দিয়ে পড়তে বললেন। আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফেরেশতা তৃতীয়বার ধরে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করায় আমার ভীষণ কষ্ট হলো। এবার তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেনঃ

﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ۝٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ۝٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ۝٥﴾ [العلق: ١، ٥]

"আপনার রবের নামে পড়ুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট রক্ত থেকে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর আপনার রব সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিখিয়েছেন তা যা সে জানত না।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতগুলোকে আয়ত্ব করে বাড়ি ফিরলেন। তাঁর হৃদয় তখন ভয়ে কাঁপছিল। তিনি খাদীজার নিকট এসে বললেন, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। তিনি তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। পরে তাঁর ভয় চলে গেলে তিনি খাদীজার নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, আমি আমার জীবন সম্পর্কে আশংকা বোধ করছি। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন- না, ভয় নেই। আল্লাহর কসম, তিনি কখনই

আপনাকে অপমানিত করবেন না। কারণ আপনি নিজ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন ও দুঃখীদের খেদমত করেন, বঞ্চিত ও অভাবীগণকে উপার্জনক্ষম করেন, মেহমানদারী করেন এবং সত্য পথের বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করেন। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওরাকা ইবন নওফেল ইবন আসাদ ইবন আবদুল উযযার নিকট চলে গেলেন। ওরাকা জাহিলী যুগে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় কিতাব লিখতেন। তাই আল্লাহর ইচ্ছা ও তাওফীক অনুযায়ী তিনি ইঞ্জিলের অনেকাংশে ইবরানী ভাষায় রূপান্তরিত করেন। তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সব কথা শুনতে বললেন। ওরাকা শুনতে চাইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব ঘটনা শোনালেন। ওরাকা তাঁকে বললেন, এ সেই রহস্যময় জিবরাঈল ফেরেশতা যাঁকে মুসা আলাইহিস সালামের নিকট আল্লাহ নাযিল করেন। হায়, আমি যদি তোমার নবুয়তের সময় বলবান যুবক থাকতাম ! হায় আমি যদি

সে সময় জীবিত থাকতাম ! যখন তোমার জাতি তোমাকে দেশ থেকে বের করে দিবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কি সত্যিই আমাকে বের করে দিবে? ওরাকা বললেন, হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছ, তদ্রুপ কোন ব্যক্তি কিছু নিয়ে আসলে তার সাথে অতীতেও শত্রুতাই করা হয়েছে। আমি তোমার যুগে বেঁচে থাকলে তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব। তারপর কিছুদিন পরেই ওরাকা মারা যান।[86]

মক্কায় ইসলাম প্রচারঃ প্রথমত যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ওহী নাযিল হয়, তখন প্রকাশ্যভাবে দীন প্রচারের জন্য তিনি আদিষ্ট হন নি, বরং এতে শুধু রাসূলর ব্যক্তিগত আমলের জন্য আহকাম ছিল। এ সময় কিছু দিনের জন্য ওহী বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মর্মান্তিক বেদনা বোধ করতে লাগলেন। কাফিররা তাকে বিদ্রুপ ও তিরষ্কার করতে লাগল। আবূ লাহাব

---

[86] মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী; সহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড, (করাচী: নূর মহাম্মদ কারখাসাহ ১৯৩৮/১৪১০), পৃ. ১০৪-১০৫।

বলে বেড়াতে লাগল, "মুহাম্মদের আল্লাহ মুহাম্মদকে পরিত্যাগ করেছে।" আবূ লাহাবের স্ত্রী তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগল, দেখছি, তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। এ জঘন্য বিদ্রুপে আহত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজার নিকট গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করছিলেন। তখন সূরা আদ-দোহা নাযিল হয়। তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কয়েকটি বৈষয়িক নিয়ামতের কথা উল্লেখ আছে। শেষ আয়াতে আছে; "আর তোমার প্রতিপালকের নিয়ামতের কথা তুমি বর্ণনা কর।" রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত রূপ যে নিয়ামত আল্লাহর তরফ হতে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তিনি গোপনে গোপনে তা প্রচার করতে লাগলেন।[87]

অল্পদিনের মধ্যে খাদীজা, আবু বকর, আলী, যায়েদ ইবন হারিসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম ইসলাম গ্রহণ করেন। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নবুয়তের পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

---

[87] আব্দুল খালেক, সাইয়েদুল মুরসালীন, ১ম খণ্ড (ঢাকা, ই.ফা.বা ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯০/১৪১০), পৃ. ১০৪-১০৫।

ওয়াসাল্লাম-এ বন্ধু ছিলেন এবং তাঁর সত্যবাদিতা, সাধুতা সম্পর্কে খুব ভালো জানতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁকে রিসালতের খবর জানালেন, তখন তিনি সাথে সাথেই তাঁর দাওয়াত সত্য বলে বিশ্বাস করলেন এবং কালেমা পড়ে মুসলিম হয়ে গেলেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর গোত্রের মধ্যে সবার নিকট সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। সব ব্যাপারে লোকেরা তাঁর উপর বিশ্বাস করতেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ঐ সমস্ত লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন, যাদের মধ্যে কিছু কল্যাণ ও মঙ্গলের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং ওসমান গণী, আব্দুর রহমান ইবন 'আউফ, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম এবং তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম তাঁর দাওয়াত কবুল করলেন। তিনি সবাইকে রাসূলের খিদমতে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে তাঁরা সকলেই মুসলিম হয়ে গেলেন।

এরপর আবু ‘ওবায়দা, ‘উবাদাহ ইবনুল হারিস, ইবন যায়েদ, আবু সালামা, খালিদ ইবন সাঈদ, উসমান ইবন মায‘উন এবং তার দুধভাই কুদামা ও উবায়দুল্লাহ, আরকাম ইবন আরকাম ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের সবাই কুরাইশ গোত্রের ছিলেন। কুরাইশ ব্যতীত সুহাইব রুমী, আম্মার, আবু যার গিফারী, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম ইসলাম গ্রহণ করলেন।

এ সময় পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত গোপন ছিল। ইবাদত ও শরীয়তের আমলসমূহ গোপনে কথা হতো। এমনকি পিতা পুত্র হতে এবং পুত্র পিতা হতে লুকিয়ে নামায পড়ত। যখন মুসলিমদের সংখ্যা ত্রিশোর্ধ হয়ে গেল তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের জন্য একটি প্রশস্ত ঘর তৈরী করলেন, যেখানে সবাই একত্রিত হতেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালিম দিতেন।

এ পদ্ধতিতে ইসলামের দাওয়াত তিন বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। এ সময় কুরাইশদের এক বিশেষ জামা‘আত ইসলাম গ্রহণ

করে। এরপর আরো অন্যান্য লোক ইসলাম গ্রহণ শুরু করল। এ খবর মক্কায় ছড়িয়ে পড়ে এবং জনগণের মাঝে বিভিন্ন জায়গায় তা আলোচনা হতে থাকে। তাই এখন প্রকাশ্যভাবে সত্যের দাওয়াত পৌঁছানোর সময় এসে গেছে।[88]

প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত:

তিন বছর পর বিপুল পরিমাণে নারী পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল এবং জনগণের মধ্যে এটা আলোচিত হতে লাগলো। তখন প্রকাশ্যে দাওয়াত পৌঁছে দিবার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন:

﴿ فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٩٤ ﴾ [الحجر: ٩٤]

"হে নবী! আপনি প্রকাশ্যে প্রচার করতে থাকুন, যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে এবং মুশরিকদেরকে আদৌ পরওয়া করবেন না।"[89]

---

[88]সীরাতু খাতিমিল আম্বিয়া, পৃ. ২৪-২৫।

[89] আল-কুরআন, সূরাতুল হিজর, আয়াত ৯৪।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে তা পালন করলেন এবং মক্কায় সাফা নামক পাহাড়ে চড়ে কুরাইশ গোত্রের নাম ধরে আওয়াজ দিলেন। যখন সমস্ত গোত্রের লোকেরা একত্রিত হল, তখন তিনি সর্বপ্রথম জিজ্ঞেস করলেন, যদি তোমাদের এ সংবাদ দেই যে, শত্রুসৈন্য তোমাদেরকে আক্রমণের জন্য আসছে এবং তোমাদের উপর লুটতরাজ করবে, তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? এটা শুনে সবাই বলল, নিশ্চয়ই আমরা আপনার সংবাদ সত্য বলে বিশ্বাস করব। কেননা আজ পর্যন্ত আমরা আপনাকে মিথ্যা কথা বলতে দেখিনি।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবললেন, আমি তোমাদেরকে খবর দিচ্ছি যে, যদি তোমরা তোমাদের বাতিল আকীদা না ছাড়, তাহলে মহান আল্লাহর কঠিন শাস্তি তোমাদের উপর নেমে আসবে। তিনি আরো বললেন, আমার যতটুকু জানা আছে, তাতে দুনিয়াতে কোন মানুষ স্বীয় গোত্রের জন্য এ উপহারের চেয়ে উত্তম কোন উপহার নিয়ে আসেনি, যা আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি। মহান আল্লাহ আমাকে নির্দেশ

দিয়েছেন যে, আমি তোমাদেরকে এর দিকে আহ্বান করি। আল্লাহর শপথ, যদি আমি সমস্ত দুনিয়ার মানুষের নিকট মিথ্যা বলতাম, তবুও তোমাদের সামনে মিথ্যা বলতাম না। যদি সমস্ত লোককে ধোঁকা দিতাম কিন্তু তোমাদেরকে ধোঁকা দিতাম না। ঐ পবিত্র সত্তার শপথ, যিনি এক এবং যার কোনো সমকক্ষ ও অংশীদার নেই। আমি তোমাদের নিকট বিশেষ করে সমস্ত দুনিয়াবাসীর জন্য আল্লাহর পয়গম্বর ও রাসূল।[90]

কুরাইশদের অত্যাচার:

যখন ইসলাম ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে লাগল তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গতিসম্পন্ন সাহাবীগণের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তাঁদের নিজ নিজ বংশ ও গোষ্ঠী। কুরাইশদের আক্রোশ সকল দিকে প্রতিহত হয়ে নিঃস্ব মুসলিমদের উপর পতিত হলো। সহায়-সম্বলহীন, আশ্রয়হারা এ সকল দরিদ্র মুসলিম কেউ ছিলেন দরিদ্র মুসাফির,

[90] সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া, পৃ. ২৪-২৫।

কেউ ছিলেন খরিদা গোলাম, আবার কেউ প্রতিপত্তিহীন বংশের লোক, জনসমাজে যাদের প্রতিষ্ঠাই ছিল না। এদের উপর কুরাইশরা যে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিল পৃথিবীর ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। সেই দুর্দিনে দরিদ্র মুসলিমদের পক্ষে ছিল জীবন মরণ সমস্যা।[91] নিম্নে দু-একটি উদাহরণ উল্লেখ করা হল:

প্রথমেই বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কথা উল্লেখ্য। তিনি ছিলেন একজন হাবশী গোলাম। তাঁর মনিব উমাইয়া ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পেরে তাঁর উপর নানারূপ অত্যাচার শুরু করল এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলল। বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছুতেই রাযী হলেন না। তাই অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল। অবশেষে তাঁর হাত-পা বেঁধে মধ্যাহ্নে সূর্যের প্রখর তাপদগ্ধ বালুকার উপর চিৎ করে শুইয়ে রাখত এবং পার্শ্ব পরিবর্তন রোধ করতে পারে এ জন্য বুকের উপর ভারী পাথর রেখে দিত। এ মুহূর্তেও তিনি

[91]সাইয়েদুল মুরসালীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৮।

বলতেন আল্লাহ এক, আল্লাহ এক। এ করুণ অবস্থা দেখে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করে নেন।[92]

খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন বিলালের ন্যায় একজন ক্রীতদাস। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে কুরাইশরা তাঁকে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে দিত এবং তাঁর বুকের উপর পা দিয়ে চেপে রাখত। শেষ পর্যন্ত জীবনে বেঁচে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু চিরদিনের মত তাঁর পৃষ্ঠে ধবল কুষ্ঠের ন্যায় সাদা দাগ পড়ে গিয়েছিল।

অনুরূপভাবে ওসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তখন কুরাইশগণ একেবারে হিংস্র পশুর ন্যায় ক্ষেপে গেল। ওসমানের পিতৃব্যের সাথে যোগ দিয়ে তারা ওসমানকে হাত-পা বেঁধে প্রত্যহ নির্মমভাবে প্রহার করত। ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর নামে তা সহ্য করে যেতেন।[93]

---

[92] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯।

[93] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।

আবিসিনিয়ায় হিজরত:

কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশ বেড়ে গেল। নতুন মুসলিমদের কাবায় কুরআন পাঠ এমনকি গৃহেও উচ্চ স্বরে কুরআন পাঠ করা ছিল অসম্ভব। এমনকি নামাজের মধ্যেও মুসলিম বিভিন্ন ভাবে নির্যাতিত হতেন। দৈহিক অত্যাচার হতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বাদ পড়েন নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের ক্রমবর্ধমান অত্যাচারে বাধ্য হয়ে সাহাবীগণকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি প্রদান করলেন।[94]

নবুয়তের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে সাহাবীগণের প্রথম দলটি মক্কা থেকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। উক্ত দলে ১২ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা ছিলেন। ওসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাদের দলপতি। তাঁর সাথে ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা রুকাইয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[94] সাইয়েদুল মুরসালীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৮।

ওয়াসাল্লাম এদের সম্পর্কে বলেন, ইবরাহীম ও লুত 'আলাইহিস সালাম-এর পর এরাই হচ্ছেন প্রথম পরিবার, যাঁরা আল্লাহর রাহে হিজরত করেন।[95]

মুসলিমগণ আবিসিনিয়ায় পৌঁছালে বাদশাহ নাজ্জাশী তাদেরকে নিজ রাজ্যে শান্তিতে বসবাস করে ধর্মকর্ম পালনের সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। মুহাজিরগণ প্রায় তিন মাস কাল শান্তি ও নিরাপদে বাস করে মক্কায় ফিরে আসলেন।

মুসলিমগণ ক্রমবৃদ্ধিতে কুরাইশরা তাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল।এ অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় আবিসিনিয়ায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন। এবার জা'ফর ইবন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে ৮৩ জন পুরুষ এবং ১২ জন মহিলার এক বিরাট দল হিজরতে অংশগ্রহণ করলেন। তাঁদের সাথে আবু মূসা আশআরীও তাঁর গোষ্ঠীর লোকজনসহ ইয়েমেনের মুসলিমগণও যোগ

---

[95] নূরুল ইয়াকীন, পৃ. ৫৬।

দিয়েছিলেন। একেই আবিসিনিয়ার দ্বিতীয় হিজরত বলা হয়। এবারেও নাজ্জাশী মুসলিমদেরকে শান্তিতে বাস করার সুবন্দোবস্ত করে দেন। মুহাজিরগণ সেখানে শান্তি ও নিরাপদে তাদের ধর্মকর্ম পালন করতে লাগলেন।[96]

আবু তালিব ও খাদীজার মৃত্যু:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর অত্যাচার, বার্ধক্য, দুশ্চিন্তা, অনিয়ম ইত্যাদি কারণে আবু তালিব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ক্রমে ক্রমে তা বৃদ্ধি পেয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যু হয় গিরি সংকটে অন্তরীণাবস্থা শেষ হওয়ার ৬ মাস পর নবুয়্যতের ১০ বর্ষের রজব মাসে।[97]

আবু তালিবের মৃত্যুর দুমাস পর (মতান্তরে তিন মাস পর) উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহাও মৃত্যুমুখে পতিত হন। নবুয়্যতের দশম বছরে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে

---

[96] আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ৯৪-৯৫; নুরুল ইয়াকীন, পৃ. ৬১।

[97] আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১১৫।

তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন অতিবাহিত করছিলেন জীবনের ৫০তম বছর।[98]

যাবতীয় বিপদ-আপদ ও অত্যাচারের প্রতিরোধে অগ্রণী ছিলেন রাসূলর চাচা আবু তালিব, আর খাদীজা ছিলেন দুর্দিন ও বিপদের পরম বন্ধু। তাঁদের মৃত্যুতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত হন। এমনিভাবে অবিরাম একের পর এক বিপদের সম্মুখীন হওয়ার কারণে সে বছরটির নাম রাখা হয় "আমুল হাযান" অর্থাৎ দুঃখ কষ্টের বছর। ইতিহাসে সে বছরটি এ নামেই প্রসিদ্ধ।[99]

রাসূলের তায়েফ গমন:

নবুয়তের দশম বছর শাওয়াল মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ গমন করেছিলেন। তায়েফ মক্কা থেকে আনুমানিক আট মাইল দূরে অবস্থিত। যাতায়াতের এ পথ

---

98 প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

99 প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭; নূরুল ইয়াকীন, পৃ. ৬৩।

অতিক্রম করেছিলেন তিনি পদব্রজে। সঙ্গে ছিল তাঁর ক্রীতদাস যায়েদ ইবন হারেস। পথিমধ্যে তিনি যে গোত্রের সাক্ষাৎ পান তাদেরকে তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তাঁর আহবানে কেউই সাড়া দিল না।[100]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফে দশদিন অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু সকলেই বলল, তুমি আমাদের রাজ্য থেকে বের হয়ে যাও। ফলে ভগ্ন হৃদয়ে নানা কষ্ট নিয়ে প্রতাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে অসংখ্য ছেলেকে তাঁকে অপমানিত করার জন্য লেলিয়ে দেওয়া হল। ইতোমধ্যে পথের দুপাশে ভিড় জমে গেল। তারা হাত তালি, অশ্লীল কথাবার্তা বলে তাঁকে গালমন্দ দিতে ও পাথর ছুঁড়ে আঘাত করতে থাকল। আঘাতের ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের গোড়ালিতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে পাদুকাদ্বয়

---

[100] আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১২৫।

রক্ষাক্ত হয়ে গেল।[101] তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে আসার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিবাহ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অনুরোধে তাঁর কুমারী কন্যা আয়েশাকেও এ সময় বিবাহ করেন।[102]

ইসরা ও মিরাজ:

হিজরতের পূর্বে মহান আল্লাহ ইসরা ও মি'রাজের মাধ্যমে তাঁর নবীকে সম্মানিত করেন। ইসরা হলো একই রাত্রিতে বায়তুল মাকদাসে গমন করা এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করা। অতঃপর মি'রাজ হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উর্ধ্ব জগতে আরোহণ করা।[103]

---

[101] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

[102] মুহাম্মদ আবদুল লতিফ, সীরাতে সাইয়্যিদিল মুরসালীন (ঢাকা: সাউদিয়া কুতুবখানা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬), পৃ. ৬৭।

[103] নুরুল ইয়াকীন, পৃ. ৬৯।

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা‘বার হাতিমে শুয়েছিলেন। এমন সময় জিবরাঈল ‘আলাইহিস সালাম তাঁকে জাগিয়ে বুরাক নাম বাহনের মাধ্যমে বায়তুল মাকদাসে নিয়ে যান এবং সেখানে তিনি সমস্ত নবীর ইমাম হয়ে সালাত পড়েন।[104] অতঃপর একটি সিঁড়ির মাধ্যমে তিনি বায়তুল মাকদাস থেকে আসমানের দিকে উপরে উঠেন। প্রতিটি আসমানের দরজায় গেলে প্রহরারত ফেরেশতা তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়। প্রতিটি আসমানেই তিনি আগের নবীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।[105] অতঃপর সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছেন। সেখানে বায়তুল মা‘মুরের কাছে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম-কে দেখতে পান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বচক্ষে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখতে পান। সে সময় মহান আল্লাহ তাঁর উম্মতের উপর ৫০ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেন। পরে তা হ্রাস করে মহান আল্লাহ ৫ ওয়াক্তে

---

[104] হামেদ মাহমুদ লিমুদ, মুনতাকান নুকুল (মাক্কাতুল মুকাররামাহ: রাবেতা আ’লাম আল ইসলামী, তা. বি), পৃ. ২১৮।

[105] আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১৩৮।

পরিণত করেছেন।[106] অতঃপর কুরাইশদের মাঝে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে তারা ঠাট্টা ও উপহাসের সাথে সেটাতে মিথ্যারোপ করল। কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেটাকে নির্দ্বিধায় সত্য বলে বিশ্বাস করেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 'সিদ্দীক' উপাধিতে ভূষিত করেন।

'আকাবার শপথ:

তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্ব যাত্রীদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করেন। এ সময় মদীনার আউস ও খাযরাজ বংশদ্বয় তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য রাসূলর মত একজন যোগ্য নেতার খোঁজ করছিল। ৬ জন খাজরাযীয় ৬২০ খৃ. মক্কায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা প্রতিজ্ঞা করে যে, এক আল্লাহর ইবাদত ছাড়া তারা আর মুর্তি পূজার ধারেও যাবেন না কিংবা

---

[106] মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহ্হাব, মুখতাসারু সীরাতুল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল মামলাকাতুল আরাবীয়া; আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৫৬/১৩৭৫, পৃ. ৪৫।

অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করবে না।[107] কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে তাঁরা ছিলেন ৭ জন। তাঁরা হলেন মু‘আয ইবনুল হারেস, যাকওয়ান ইবন আবদিল কাইস, উবাদা ইবন সামিত, ইয়াযিদ ইবন সা‘লাবা, আব্বাস ইবন উবাদা, আবুল হাইসাম ও উ‘আইম ইবন সা‘য়েদাহ। ইতিহাসে এটাই আকাবার প্রথম শপথ নামে পরিচিত।[108]

পরের বছর হজ্ব মৌসুমে ইয়াসরিব থেকে ১০ জন খাযরাজ এবং দুজন আউস গোত্রের লোক মক্কায় এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল যে, মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত তারা ইসলামের অনুসারী থাকবে এবং এর জন্য জানপ্রাণে যুদ্ধ করবে। আর এটিই আকাবার দ্বিতীয় শপথ নামে পরিচিত।[109]

এ দলের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুস‘আব ইবন উমাইরকে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে

---

[107]আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১৪৩।

[108] মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ, পৃ. ১৪৮।

[109] আত তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭০।

সবাইকে দীন ইসলাম শিক্ষা দেন এবং তাঁর হাতে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করল। মওসুম শেষে তিনি রাসূলের কাছে তাদের ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ নিয়ে ফিরে এলেন।

পরের বছরে হজ্বের মৌসুমে ২ জন মহিলাসহ ৭৫ জন ইয়াসরিববাসী মক্কায় এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করলেন। এবার তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ইয়াসরিব যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন এবং তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁদের দেশে ইসলাম প্রচারে যাবতীয় সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন। ইতোমধ্যে ইয়াসরিবে প্রেরিত মুস‘আব ইবন উমাইর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর ইসলাম প্রচারের শুভ সংবাদ তাদের মাধ্যমে জেনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশী হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের ডাকে সাড়া দিলেন এবং তাঁদের দেশে যাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেললেন। এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায়

বসে রইলেন। এটাই ইসলামের ইতিহাসে আকাবার দ্বিতীয় শপথ নামে পরিচিত।[110]

মদীনায় হিজরত:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করবেন এ সংবাদ মক্কায় প্রকাশ পেলে মক্কাবাসী তাঁর উপর নানাবিধ অত্যাচার শুরু করল। এমনকি তারা তাঁকে হত্যার প্ররোচনাতেও নেচে উঠল। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যার পাপময়, ঘৃণ্য ও জঘন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো তখন জিবরাঈল 'আলাইহিস সালাম মহান আল্লাহর তরফ থেকে ষড়যন্ত্রের কথা জানালেন। তিনি বললেন, আপনার প্রভু আপনাকে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেছেন।

আপনি এ যাবত যে শয্যায় শয়ন করেছেন আজ রাত্রে সে শয্যায় শয়ন করবেন না। এ কথার মাধ্যমে হিজরত করার সময় নির্ধারণ করে দেয়া হল।

---

[110] মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, পৃ. ১৪৮-১৫০; নুরুল ইয়াকীন, পৃ. ৭৬-৭৭।

হিজরত সংক্রান্ত ওহী নাযিল হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক দুপুরে আবু বকরের ঘরে তশরীফ নিয়ে আসলেন। উদ্দেশ্য ছিল হিজরতের সময় ও পন্থা প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা। আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, আমরা আব্বার বাড়িতে ঠিক দুপুরে বসেছিলাম। জনৈক ব্যক্তি এসে সংবাদ দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা ঢেকে আগমণ করেছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি এ সময় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার জন্য এসেছেন?

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে আসার অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হলো এবং তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হিজরত করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক। অতঃপর হিজরতের সময় সূচী নির্ধারণ করে রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং রাতের আগমণের জন্য প্রতীক্ষায় রইলেন।[111]

এদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরতের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন পাপিষ্ঠরা তাঁকে মারার জন্য দারুন নদওয়াতে বৈঠক আহ্বান করল। এ সময় ইবলিশ নাজদের এক শায়খের রূপ ধরে সেখানে আগমন করল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মারার জন্য পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করল।[112] এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذۡ يَمۡكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثۡبِتُوكَ أَوۡ يَقۡتُلُوكَ أَوۡ يُخۡرِجُوكَۚ وَيَمۡكُرُونَ وَيَمۡكُرُ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ ٣٠ ﴾ [الانفال: ٣٠]

"আর ঐ সময়কে স্মরণ কর যখন কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল এ জন্য যে, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে অথবা বিতাড়িত করবে। আর তারা নিজেদের তদ্বির

---

[111] আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১৬০।

[112] নুরুল ইয়াকীন, পৃ. ৭৮-৭৯।

করছিল এবং আল্লাহ আপন তদ্বির করছিলেন, আর আল্লাহ হচ্ছেন উত্তম তদ্বিরকারী।[113]

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সাথে নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওনা হলেন। এদিকে কাফিররা তাঁকে ধরার জন্য পিছে ধাওয়া করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে সওর গুহায় আশ্রয় নিলেন। এদিকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর গোলাম আমের ইবন ফুহায়রা পর্বতের ময়দানে ছাগল চরাতো এবং যখন রাত্রির এক অংশ চলে যেত তখন সে ছাগল নিয়ে গারে সওরের নিকট যেত এবং আত্মগোপনকারী নবী ও তাঁর সাথীকে দুধ পান করাতো। পরপর তিন রাতই সে এরূপ করল। অধিকন্তু আব্দুল্লাহ ইবন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পদচিহ্নগুলো মিশিয়ে যেতো।[114]

---

[113] সূরা আল আনফাল, আয়াত ৩০।

[114] মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, পৃ. ১৫৫।

এদিকে কাফিররা তাদেরকে খুঁজতে খুঁজতে গুহার মুখে এসে উপস্থিত হলো। এ সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, তারা সংখ্যায় অনেক, আমরা মাত্র দুজন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমরা তিনজন। আমাদের সাথে আল্লাহও আছেন[115]। অবশেষে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীকে না পেয়ে প্রত্যাবর্তন করল।[116]

এরপর গুহা থেকে বের হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনার দিকে হাঁটা শুরু করলেন। প্রথম কুবায় পৌঁছলেন, তারপর পথিমধ্যে জুম'আর নামায শেষে তাঁরা মদীনায় প্রবেশ করলেন। ঐ দিন থেকেই মদীনাবাসী ইয়াসরিব নাম পরিবর্তন করে মদীনাতুন্নবী নামে

---

[115] এ সাথে থাকার অর্থ, আল্লাহর সামনে থাকা, তাঁর হেফাযতে থাকা। এর অর্থ কখনই নয় যে, আল্লাহ কারও গায়ের সাথে লেগে আছে, বা সৃষ্টির ভিতরে আছেন। কারণ আল্লাহ আরশের উপর আছেন। [সম্পাদক]

[116] আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১৬৬।

অভিহিত করেন ।[117] এ দিনটি ছিল ৬২২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর। এ দিবসের মাধ্যমেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মক্কার জীবনের অবসান ঘটল এবং শুরু হল মদীনার জীবন।

[117] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।